কেন্দু ঘাট

সত্যচরণ চক্রবর্তী



প্রকাশ করেছেন—
শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য-কুটীর প্রাইভেট্ লিমিটেড
২১, ঝামাপুকুর লেন
কলিকাতা—৯

অগ্রহায়ণ—
১৩৬৭

ছেপেছেন—
এস. সি. মজুমদার
দেব-প্রেস
২৪, ঝামাপুকুর লেন
কলিকাতা—৯

উপহার



প্রেমের হাট

প্রথম পরিচ্ছেদ



শ্রাবণের দ্বিপ্রহর। বর্ষণের বিরাম নাই। আদি-অন্তহীন মেঘ সারা আকাশ জুড়িয়া আছে। যত জল ঢালিতেছে, তার চেয়ে দশগুণ জল জমাইয়া রাখিতেছে। দিনের আলো কিছুতে নিজেকে প্রকাশ করিতে পারিতেছে না—দিন থাকিতে-থাকিতেই দিনের আলো ঢাকিয়া মেঘের দল চক্রান্ত করিয়া সন্ধ্যার সূচনা করিয়া বড় রকম দুর্যোগের আভাস জাগাইয়া তুলিতেছে। কাঁখে পিতলের ছোট কলসী ঘোষেদের সোনা বাঁধা-পুকুরে আসিয়া স্নান করিয়া কাপড় কাচিয়া কলসীতে জল ভরিয়া ঘরে ফিরিবে,

দুর্যোগের আভাস দেখিয়া সে একটু উন্মনা—ঘাটে দুটা কি চারিটা সিঁড়ি নামিয়াছে—হঠাৎ কি দেখিয়া বিস্ময়ে সে অস্ফুট চীৎকার তুলিল।

পুকুর-পাড়ে একটু দূরে ঝাঁকড়া একটা বিলাতী আমড়া গাছের তলায় ছোট ছপ্পর। এ ছপ্পর সদ্য তৈয়ারী। ছপ্পরে বসিয়া গাঁয়ের জমিদার বোস বাবুর বড় ছেলে সুধীন্দ্র চার করিয়া মাছ ধরে। তার বয়স কুড়ি-একুশের বেশী নয়। মাছ ধরায় তাহার যেমন ঝোঁক ছিল, তেমনি মাছও পাইত। আজ কিন্তু সেই ছপ্পরে বসিয়া তাহারই চারে গাঁয়ের কৈবর্ত্তদের দুটো ছেলে মাছ ধরিতেছে দেখিয়া সোনার বিস্ময়ের সীমা নাই! এবং ঠিক এই মুহূর্ত্তে একটা ছেলে দাঁড়াইয়া উঠিয়া ছিপে সজোরে খ্যাচ্ মারিল। সঙ্গে সঙ্গে কড়্-কড়্ শব্দে হুইলের ডোর টানিয়া প্রকাণ্ড এক মাছ জল তোলপাড় করিয়া তুলিল। মাছটার সঙ্গে দুজনের সংগ্রাম বাধিয়া গেল যেন! ব্যাপার দেখিয়া সোনা কতক বিস্ময়ে এবং কতক বিরক্তিতে চীৎকার করিয়া উঠিল। সে চীৎকারে একটা ছেলে নিঃশব্দে তাহার কাছে ছুটিয়া আসিয়া চাপা গলায় কহিল—চেঁচিয়ো না সোনাদি—মস্ত একটা রুই মাছ—তোমাকেও ভাগ দেবো।

ভয়ে বিস্ময়ে ঘৃণায় সোনা নির্বাক···ছেলেটার দিকে চাহিল। ছেলেটার সেদিকে লক্ষ্য নাই। পুকুরের দিকে চাহিতে চাহিতে ফিস্-ফিস্ শব্দে ছেলেটা কহিল—এ পুকুর তো আর তোমাদের নেই যে আমরাও অবর-সবরে এসে দু'চারটে মাছ ধরবো। তোমাদের তালুক মুলুকের সঙ্গে সবই তো বাবুরা নিয়ে

নিয়েছে। সেই ইস্তক্ তোমাদের তো কখনো একটা চুনো পুঁটি দেয় না—দেখি। আমরা গাঁয়ের গরীব-গুর্বো লোক কখনো-সখনো ছিপে দু'-একটা ধরবো, তারও জো নেই। পুকুর-পাড়ে মালীর ঘর বেঁধে দেছে দিন-রাত তারা কড়া পাহারা দিচ্ছে।

—"কেন দেবে না ?"—বলিয়া, সোনা দৃপ্তকণ্ঠে প্রতিবাদ তুলিল। সোনা বলিল—সুধী-দার মাছ ধরবার সখ্—তাই, পুকুর খাশ করে রেখেছে—বিলি করেনি। বছর-বছর কত মাছ ছাড়ে, দেখেছিস্ তো! সুধী-দা ছাড়া বাড়ীর কাকেও কখনো ছিপ্ ফেলতে দেখেছিস্ কোনো দিন ?

—নিজের মাছ ধরার সখ···পরকে দেবে কেন ? তাইতো আজ সুবিধে পেয়ে আমরা এসেছি। বলিয়া সে ছেলেটি মৃদু হাসিল। তারপর বলিল—তা আমরা তো আর জালে মাছ ধরছি না—লুকিয়েও ছিপ্ ফেলতে আসিনি। সকাল বেলা আকাশ একটু ফরসা হতে বড়বাবু এসে ছিপ্ ফেলে বসেছিলেন, আমরাই বোলতার টোপ এনে দিয়েছি। তারপর, আকাশ অন্ধকার করে বৃষ্টি নামলো—ছিপ্ ফেলে তিনি বাড়ী চলে গেলেন, মার্কণ্ড মালীকে ব'লে গেলেন ছিপ্‌টিতে নজর রাখতে। মালীদের জলে ভিজতে বয়ে গেছে !

সোনা কেমন অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল! ছেলেটির কথা তখনো শেষ হয় নাই···সে বলিল—বামুন গেল ঘর, তো নাঙ্গল তুলে ধর! উঃ···দেখেছো সোনাদি, কত বড় মাছ!···ক্যাঙ্গ্‌লাও ছিপের ওস্তাদ—ও ঠিক ওকে তুলবে।

একটু দাঁড়িয়ে দেখো না মজা।···হ্যাঁ, বেশ কাবু করে এনেছে।

সোনা অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া জলের দিকে চাহিয়া দেখে, মাছটা অনেকখানি আসিয়া এদিক ওদিক ঝাঁপাঝাঁপি করিলেও সূতা লইয়া আর বেশীক্ষণ ধস্তাধস্তি করিবার সামর্থ্য তার নাই। ওদিকে বর্ষণ মৃদু হইলেও হুইল গুটাইবার শব্দ তাহার ওষ্ঠের শব্দে চাপা পড়িয়াছে, সুতরাং মালীদেরও কানে শব্দ যাইবার সম্ভাবনা নাই।

একবার এদিকে ওদিকে চাহিয়া সোনা বলিল—সুবিধা পেয়েছিস্ বলে এত বড় মাছটা চুরি করবি রে?

—কেন! চুরি কিসের! এ এক রকম বলে কয়েই—

বলিতে বলিতে কথা অসমাপ্ত রাখিয়া ছেলেটা ক্যাঙ্গ্‌লার দিকে ফিরিয়া, গলা যথাসম্ভব খাটো করিয়া ক্যাঙ্গ্‌লাকে বলিল, —আস্‌তে দেরে—আস্‌তে দে,—এই দিকেই সুবিধে! ওদিকে গড়ানে জায়গা—নামা যাবে না।

রাগিয়া সোনা কহিল—কি, আসতে দেবে? না, ককখনো না! চুরি করতে আমি দেবো না।

তাহার দিকে ফিরিয়া মিনতি-ভরা কণ্ঠে ছেলেটি বলিল—তোমার পায়ে পড়ি সোনাদি, তুমি···তুমি চেঁচিয়ো না। মাছটা ঘাটের কিনারায় এসে পড়েছে। কেউ আসতে না আসতে এখনি তুলে ফেলবো আমরা।

মাছটাকে ঠিক ঘাটের পাশে আনিয়া অল্পে অল্পে হুইল গুটাইয়া কাছে আসিতে আসিতে ক্যাঙ্গ্‌লা খুব নীচু

গলায় বলিল,—শীগ্‌গির—শীগ্‌গির রে মাণকে জলে নেমে পড়।

রাগে সোনার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল। মুখ চোখ রাঙা করিয়া সে প্রতিবাদ করিবারও অবসর পাইল না। চোখের পলকে তাহারই কাঁধ হইতে, তাহারই গামছাখানা মাণিক ঝাঁ করিয়া টানিয়া জলে নামিয়া পড়িল, বলিল—মাপ করো সোনাদি ভাই, রাগ করোনা,—গামছা না হলে অত বড় মাছটাকে ছেঁকে তোলা যাবে না। একটু চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখ না—উঃ—প্রকাণ্ড মাছ!

শশব্যস্তে গামছা ছাঁকিয়া মাণিক মাছটাকে ডাঙ্গায় তুলিতে ব্যস্ত হইল। সঙ্গে সঙ্গে ছিপ্ গুটাইতে-গুটাইতে ক্যাঙ্‌লাও সোনার কাছাকাছি আসিয়া খুশী-ভরা কণ্ঠে বলিল—দেখছো সোনাদি,—কেমন সিঁদুর-পানা রাঙা টক্‌টক্ কচ্ছে! অনেক দিনের পুরোনো মাছ, পাঁচ-ছ'সের, উঁহু, আট-দশ সের হবে। এ খালি আজ তোমার পয়েই হয়েছে সোনাদি, নাহলে বড়বাবু তো হামেসা ছিপ্ ফেলে বসে থাকেন—এত বড় মাছ কখনো তিনি ছিপে গাঁথতে পেরেছেন?

বলিতে বলিতে সে-ও ছিপ্ ফেলিয়া মাণিককে সাহায্য করিবার জন্য তাড়াতাড়ি জলে নামিয়া পড়িল···সোনা কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। কি করিবে ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছে না! গামছায় জড়াইয়া একটু পরে মাছটাকে অতি কষ্টে ডাঙ্গায় তুলিয়া সোনার পায়ের কাছে সিঁড়ির উপর ধপ্ করিয়া ফেলিতেই সোনা আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না,

উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল—দ্যাখ ক্যাঙ্গ্‌লা আর মাণ্‌কে, সত্যি ভালো হবে না বলছি—এত-বড় মাছ তোদের আমি চুরি করতে দেবো না।

কাঙ্গাল আর মাণিক দুজনেই তখন মাছটার মুখ হইতে বঁড়্‌শী খুলিতে ব্যস্ত। মাছটা এমন ল্যাজের ঝাপটা মারিয়া লাফাইয়া ধড়ফড় করিতেছিল যে, সোনার কথার জবাব না দিয়া কাঙ্গাল বলিল—একবার এসো না ভাই সোনাদি, লক্ষ্মীটি, এর ল্যাজটা একটু চেপে ধরবে! ওঃ শালার কি জোর! যেন হাঙ্গর, না, কুমীর!

সোনার বিস্ময় বাড়িল। চুরিতে ভয় না পাইয়া তাহাকেই সাহায্য করিতে ডাকে! সে হুঙ্কার তুলিল—আ গেল যা··· যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা! এখানে কেউ নেই বলে এত-বড় আস্পর্দ্ধা আমাকে এ চুরির কাজে ডাকিস্! জানিস্ আমি এখনি গিয়ে!—

মাণিক তখন পরম আরামে মাছটার উপর চাপিয়া বসিয়াছে! সোনার কথায় বাধা দিয়া সে বলিল—বোকার মত কেন রাগারাগি চেঁচামেচি করছো সোনাদি! মালীদের ঘর ঐ ওধারে,—এই বিষ্টিতে তোমার চেঁচামেচি কেউ শুনতে পাবে না। বলছি, তোমাকে ভাগ দেবো—

সোনা নাক-মুখ বাঁকাইয়া বলিল,—ঝাঁটা মারি তোর মাছের ভাগে! জল-বিষ্টিতে কেউ এখানে নেই—তাই ভেবেছিস, এত-বড় মাছটা চুরি করে নিয়ে পালাবি? আমি সব দেখেছি —মালীরা না-ই বা শুনতে পেলে!

কাঙ্গাল তখন একটা বঁড়শী খুলিয়া আর একটা বঁড়শী খুলিবার চেষ্টা করিতেছে, সোনার কথায় উত্ত্যক্ত হইয়া বেশ রুক্ষ মেজাজে সে বলিল—ও, তুমি দেখেছো তো বড় বয়েই গেছে! আমরা দু'জন আছি, দেখছো! তুমি আমাদের আট্‌কে রাখতে পারবে না! মালীরা আস্‌তে না আস্‌তে আমরা পগার পার।

সোনা বলিল—দিনে ডাকাতি! আমি একলা আছি বলে কি করবি, শুনি? আমাকে মারবি নাকি? বলিয়া সোনা দু'পা আগাইয়া গেল ক্যাঙ্গ্‌লার দিকে এবং সাহসের ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া সদম্ভে বলিল—কেমন করে নিয়ে যেতে পারিস, দেখি! যা, নিয়ে যা! লজ্জা করে না?

মাণিক মাঝে পড়িয়া মিটাইয়া দিবার উদ্দেশ্যে মিষ্ট করিয়া কহিল—আঃ, কেন গোলমাল করো সোনাদি! তোমাকে ভাগ দেবো, বলছি। এত কষ্ট করে ধরলুম,—আর একটু—

—ফের ঐ কথা! দাঁড়া, দেখাচ্ছি মজা। বলিয়া সোনা মালীদের ঘরের দিকে চাহিয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিল—মালী···মালী ওরে মালী—

মালীদের কোনো সাড়া নাই। ঝমঝম শব্দে বৃষ্টি পড়িতেছে ···ভ্রূ বাঁকাইয়া সোনা উঠিল ঘাটের চাতালে। কাঙ্গাল তখনো দ্বিতীয় বঁড়শী খুলিতে পারে নাই। মাছ ছাড়িয়া মাণিক ছুটিয়া গিয়া সোনার পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল, বলিল—ছি সোনাদি, তুমি বুঝচো না কেন! মালীদের ডাকছো—তারা এসে

তোমাকেও যদি চোর মনে করে? যদি ভাবে, আমাদের দলে মিশে তুমিও—

সোনা একেবারে তিড়বিড় করিয়া উঠিল। বলিল—ইস্, তোর ভারী চ্যাটাং চ্যাটাং কথা তো! আমাকে মনে করবে তোদের দলে—আমিও চোর?···দাঁড়া···এখনি বুঝবি, মাছ চুরি করা অত সহজ নয়!

এই পর্য্যন্ত বলিয়া মালীর ঘরের দিকে চাহিয়া সে আবার ডাকিল—মালী···মালী—

কিন্তু মালীদের আসিতে হইল না, তাহাদের পরিবর্ত্তে যাহারা আসিল, তাহাদের দেখিয়া মাণিক ভয়ে কাঠ! চকিতের জন্য! তার পরই বিকৃতকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল—ওরে পালা রে ক্যাঙ্গ্‌লা, পালা শীগগির—

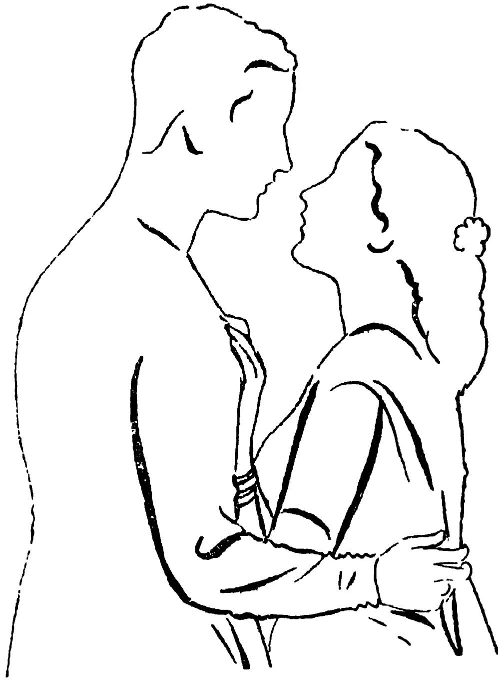
বলিয়াই নিজে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুট দিল। সোনা হাত-তালি দিয়া কহিল—কেমন, এখন? হতভাগা চোর কোথাকার!

মাণিকের পলায়নের চেষ্টা ব্যর্থ হইল। যেদিকে ছুটিয়াছিল, সেদিককার একটা ঝোপ হইতে লোটা হাতে তেওয়ারী দরোয়ান বাহির হইয়া তাহাকে 'গিরিপ্তার' করিয়া ফেলিল। ঠিক সেই সময় গামছা-কাঁধে দাঁতন করিতে করিতে স্নান করিতে আসিলেন ম্যানেজার গিরিশ মিত্তির—আসিয়া সোনার দিকে চাহিয়া তিনি প্রশ্ন করিলেন—কি হয়েছে সোনা? মালীদের ডাকছিলে যে!

সোনা তড়বড় করিয়া এক-নিশ্বাসে ব্যাপারটা বলিল।

গিরিশবাবু চোখ লাল করিয়া হুকুম দিলেন—বাঁধো হারামজাদাকো—লে আও হামারা পাশ।

হুকুমের অপেক্ষা ছিল না! ম্যানেজার বাবুর মুখের কথা শেষ হইবার আগেই মাণিককে তাহারই কোঁচায় বাঁধিয়া তাহারা আনিয়া ঘাটের সিঁড়ির উপর ফেলিল। ক্যাঙ্‌লা বাগানের ভিতর দিয়া পলাইয়াছে। গোলমালে মালীরা বাহির হইয়া তাহাকেও ধরিয়া সেইখানে আনিয়া বসাইল।



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মাছটা তখনো এক-একবার লাফাইয়া জলে পড়িবার চেষ্টা করিতেছে। উপর হইতে দেখিয়া গিরিশবাবু দ্রুত পায়ে সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া নামিয়া গেলেন। এত-বড় মাছ! তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। বলিলেন—উঃ এত-বড় মাছটা মেরেছে হারামজাদারা! এর পর ডাকাতি করবে, দেখছি।

সোনা নামিয়া আসিয়া কহিল,—আমি তখন থেকে মানা করছি, আমাকে বলে কিনা, তোমাকে ভাগ দেবো···দেখুন না, আমারই গামছা কেড়ে নিয়ে মাছটাকে ধরে তুলেছে। আবার ভয় দেখানো! বলে, তুমি একলা, আমরা দু-জন—কর্‌বে কি?

গিরিশবাবু বলিলেন—কি কর্‌বো, দেখাচ্ছি! তিনি চাহিলেন তেওয়ারীর দিকে, বলিলেন—লাগাও উল্লুকো বাচ্চাকো!

বাবুর আদেশের পূর্ব্বেই, তেওয়ারী কাজটা আধা-আধি সারিয়া না লইয়াছে এমন নয়, রঘু এবং মার্কণ্ড মালী—তারাও এ সুযোগ উপেক্ষা করে নাই! ম্যানেজারবাবু আছেন, তেওয়ারী আছে দেখিয়া তাহারা জোর পাইয়াছে—সে জোর দেখাইয়া বাহাদুর বনিবার জন্য ক্যাঙ্‌লাকে বেশ দু চার ঘা দিতে ছাড়ে নাই। এখন ম্যানেজার বাবুর হুকুম পাইয়া, তিনজনে পরম-

উৎসাহে সে কাজ এমন ভাবে সম্পন্ন করিতে লাগিল, মাণিক এবং কাঙ্গাল প্রহারের সে যাতনা সহ্য করিতে না পারিয়া কান্নার বন্যা বহাইয়া দিল। কাঁদিতে কাঁদিতে দুজনে বলিল,—দোহাই বাবু, দোহাই, আপনার দুটি পায়ে পড়ছি, এবারকার মত আমাদের ছেড়ে দিন।

—দেবো ছেড়ে! বলিয়া গিরিশচন্দ্র গর্জ্জন তুলিলেন।

—হতভাগাদের হাড় এক জায়গা, মাস এক জায়গা, না করে ছাড়বো না। চুরি করে করে ভুক্তিনাশ—এমন বুকের পাটা! দিনে দুপুরে ডাকাতি! যেমন বুনো ওল, আমি তেমনি বাঘা তেঁতুল—হাড়ে হাড়ে বুঝিয়ে দেবো। দাঁড়া, তোদের হয়েছে কি—গারদে পুরে কড়ি গুণিয়ে তোদের ছাড়বো!

বলিতে বলিতে মাছটাকে তিনি পরীক্ষা করিতে বসিলেন। ম্যানেজার বাবুর আচরণের মর্ম্ম বুঝিতে কাহারও বাকী রহিল না! এ ঘটনা কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে, তাহা ভাবিয়া অনেকে শিহরিয়া উঠিল। তেওয়ারী আধা বাংলা আধা হিন্দীতে কহিল—আরে বিকুব্, এসা কাম কাহে কিয়া? এখুন তোদের সব-আদ্‌মি জান্‌সে মারা যাওগে।

বলিতে বলিতে দুজনের গালে দুটি চড় কসাইবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিল না। দেখাদেখি, রঘু এবং মার্কণ্ডও বীরত্ব ফলাইতে দু চারটা চড় বসাইল। কাঙ্গাল এবং মাণিক কাঁদিয়া উঠিল—ওরে বাবারে—গেলুম রে!

হাসিয়া গিরিশচন্দ্র শাসাইলেন—হুঁ! মাছ খাওয়া অমনি

নয়। দে বেটাদের পেট ঠেসে খাইয়ে। বলিয়া তেওয়ারীকে ইঙ্গিত করিলেন।

মাণিক ও কাঙ্গালের উপর আবার প্রহার-বর্ষণ। এবার আর তাহারা সহ্য করিতে পারিল না, সেখানে লুটাইয়া পড়িল। পড়িয়া চীৎকার—'ওগো পায়ে পড়ি তোমাদের, আর মেরো না, আর নয়! ও সোনাদি, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, এবারকার মতন বাঁচাও!

—কেমন, মাছ খাবে না? মাছ!

বলিতে বলিতে গিরিশচন্দ্র আনন্দে উত্তেজিত! সোনার বুকে কিন্তু আঘাত বাজিল। স্নানের কথা মনে নাই, ছুটিয়া সে গিয়া তেওয়ারী এবং মালী দুজনকে ঠেলিয়া কাঙ্গাল আর মাণিককে আড়াল করিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—আর নয়, আর নয় —মেরো না আর।

—না, মারবে না! সন্দেশ খাওয়াবে! এই বয়স থেকে ব্যাটারা পাকা চোর! তুমি ওদের কথায় কান দিও না সোনা, ব্যাটারা যে কাজ করেছে, তার ফল ভোগ করবে না?

গিরিশচন্দ্রের কথায় সোনা থতমত খাইয়া চুপ করিয়া গেল —মাণিক আর কাঙ্গাল কহিল—দোহাই বাবু, আর কখনো এমন কাজ করবো না—ককৃখনো না।

গিরিশচন্দ্র আবার চাহিলেন তেওয়ারীর দিকে, বলিলেন—এ্যায়সা মার মারো…গায়ে যেন দাগ থাকে—জন্মের মত সে দাগ আর মিলুবে না! মনে থাকবে, হ্যাঁ!

তেওয়ারী আবার ঘুষি বসাইল।

—না, খবরদার মারবে না। মারতে পাবে না। বলিয়া সোনা তাহাদের মাঝখানে দাঁড়াইয়া বলিল—এমনি করে মারে? মরে যাবে যে!

তেওয়ারী জানে, বাবুদের বাড়ী তের-চৌদ্দ বছরের মেয়েটির কতখানি প্রভাব; জানিয়া সোনার কথা ঠেলিয়া তাকে না মানিয়া ঠ্যাঙানো—তার সাহসে কুলাইল না। গিরিশচন্দ্র না জানেন এমন নয়, এবং জানেন বলিয়াই তাঁহার ক্রোধ আরও দশগুণ বাড়িয়া উঠিল। সোনার দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন—ভালো না লাগে সোনা, সরে এসো। ছেলেমানুষ ছেলে মানুষের মত থাকো, কাজে বাধা দিও না।

ঈষৎ গম্ভীর হইয়া সোনা কহিল—খুব মারা হয়েছে—আর নয়। এতগুলো মানুষ মিলে মার—ওদের খুন করতে চান না কি? না, আমি তা হতে দেবো না। কিছুতেই না।

—তুমি এর মধ্যে থেকো না সোনা—নেয়ে চলে যাও। ব্যস!

—যেতুম—তোমরা যদি না এই কাণ্ড করতে! একটা মাছ ধরেছে—তার জন্য অনেক বেশী মার খেয়েছে। তবু ছাড়বেন না? খুন করতে চান?

—এ তোমাদের পুতুল-খেলা নয় সোনা! জমিদারের পুকুরে চুরি করে মাছ ধরা!

—তা বলে মেরে ফেলতে হবে?

—সে পরামর্শ নিতে হবে তোমার কাছে? তুমি যাও, এখানে থেকো না—সরে যাও।

সোনা দৃপ্ত কণ্ঠে জবাব দিল—না, আমি যাবো না।

গিরিশচন্দ্র সোনার সহিত বাক্যব্যয় না করিয়া হুকুম দিলেন—লাগাও !

হুকুম পাইয়া তেওয়ারী কহিল—হঠ্ যাও দিদি, কাহে বখেড়া লাগাও ?

তারপর ধাঁ করিয়া সোনার পাশ দিয়া হঠাৎ এমন ভাবে মাণিককে একটা লাথি মারিল যে, ঘাটের শাণে মুখ ঠুকিয়া সে পড়িয়া গেল—সুমুখের একটা দাঁত ভাঙিয়া রক্তারক্তি। তাহার মুখে ফুটিল—সোনাদি গো ! শুধু এই দুটি কথা।

—রক্ষে করো সোনাদি !

সে দিকে চাহিয়া সোনা শিহরিয়া উঠিল। তেওয়ারীর দিকে ফিরিয়া সিংহিনীর মত সে গর্জ্জন তুলিল—তুমি সরে যাও, বলছি—এখনি !

হঠাৎ সেই মুহূর্ত্তে ঘাটের উপর হইতে বিস্ময়-জড়িত কণ্ঠে কে বলিল—'কি ব্যাপার ? কি হয়েছে ?'

মুহূর্ত্তে যেন ভোজবাজী ! সে স্বর শুনিবামাত্র তেওয়ারী এবং মালীরা চমকাইয়া পিছনে হঠিয়া গেল। সে দিকে চাহিয়া সোনা অনেকখানি কাঁদ-কাঁদ ভাবে বলিল—ছাখো সুধী-দা এদের কাণ্ড !

তারপর মুখে আঁচল চাপিয়া সোনার কান্না। দ্রুত নামিয়া আসিতে আসিতে, মাণিক ও কাঙ্গালের প্রতি চাহিয়া সুধীন্দ্র বলিল—একি, কে এদের এমন করে মেরেছে ?

ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে সোনা জবাব দিল—তোমাদের ঐ লোকেরা। চুরি করে মাছ ধরেছিল বলে এমন মার মেরেছে

—একবার ছাখো সুধী-দা! যত বলি, ঢের হয়েছে—ছেড়ে দাও, তবু ছাড়বে না—তবু মার!

কাঙ্গাল ও মাণিকের কাছে বসিয়া সুধীন্দ্র দেখিল—দেখিয়া বলিল—ইস্, তাইতো! আ—হা—হা!

ভৃত্যদের দিকে চাহিয়া হুকুম দিল—খোল দেও জল্দি।

ভৃত্যেরা সভয়ে মাণিক ও কাঙ্গালের বাঁধন খুলিয়া দিল। তেওয়ারী সেলাম ঠুকিয়া জড়িতকণ্ঠে কহিল—কসুর মাপ্ হোয় হুজুর, মানিজর বাবুকা হুকুমসে—

সুধীন্দ্র আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—কোন্ বাবু?

—মানিজার বাবু—হুঁয়ি!

বলিয়া ঘাটের দিকে দেখাইয়া দিল। সুধীন্দ্র আসিবামাত্র গিরিশচন্দ্র নিতান্ত ভালো মানুষটির মত শেষ সিঁড়িতে পিছন ফিরিয়া বসিয়া দাঁত মাজিতে সুরু করিয়াছেন; একটি বারও উপরের দিকে ফিরিয়া চান নাই! সুধীন্দ্র সেই দিকে চাহিয়া পরক্ষণেই তেওয়ারী ও মালী—দুজনকে হুকুম দিল—ছোঁড়া দুটোকে ধরাধরি করে, আস্তে আস্তে জলের ধারে নিয়ে গিয়ে, মুখে-চোখে-মাথায় বেশ করে জল দিয়ে ধুইয়ে মুছিয়ে দে।

তারপর নিবিষ্ট মনে সেইখানে অপেক্ষা করিতে করিতে ভৃত্যদিগের কার্য্য দেখিতে লাগিল। তাহারা নীচে নামিয়া গেলে সে খাটো গলায় সোনাকে জিজ্ঞাসা করিল—ব্যাপারটা কি হয়েছে, আগাগোড়া তুমি দেখেছো সোনা?

—দেখেছি বই কি সুধী-দা, তখন আমি-ছাড়া ঘাটে আর কেউ ছিল না;—মালীরাও জানে না।

বলিয়া, সোনা আগাগোড়া সকল কথাই অকপটে শুনাইয়া দিল। সুধীন্দ্র একটু চিন্তা করিয়া কহিল—দোষ গুরুতর বটে, কিন্তু শাস্তি তার চেয়ে গুরুতর হয়েছে!

—ভাগ্যিস্ তুমি নাইতে এসেছিলে সুধী-দা। নাহলে বেচারাদের মেরেই ফেল্‌তো—আমি সাম্‌লাতে পারতুম্ না। বলিয়া সোনা একটা নিশ্বাস ফেলিল।

সুধীন্দ্র ছোট একটি 'হুঁ' দিয়া কহিল—চলো, আমরা নেয়ে নিই।

সুধীন্দ্রর সঙ্গে সঙ্গে সোনাও জলের কাছে নামিয়া আসিল, ততক্ষণে মাণিক এবং কাঙ্গাল অনেকটা সামলাইয়া উঠিয়াছে। সুধীন্দ্রর পায়ের কাছে পড়িয়া দুজনে বলিল—আর জন্মের বাপ ছিলে গো বড়বাবু—আমাদের প্রাণ রক্ষে করলে! বেঁচে থাক্‌তে এ দয়া ভুলবো না। এজ্ঞে করো, ঘরে যাই।

সুধীন্দ্রর ইঙ্গিতে একবার গিরিশচন্দ্রের পায়ের কাছে মাথা ঠুকিয়া ধীরে ধীরে তাহারা যাইবার উপক্রম করিল।

সুধীন্দ্র কহিল—কৈরে, মাছটা নিয়ে গেলিনে?—নিয়ে যা।

মাণিক আর কাঙ্গাল নামিয়া আসিয়া জোড় হাতে কহিল—দোহাই বাবু, ও হুকুম আর করনি। আজ যা শিক্ষে হয়েছে, প্রাণ থাক্‌তে ভুলবো না।

মৃদু হাসিয়া সুধীন্দ্র কহিল—ভয় নেই, আমি বলছি নিয়ে যা! এই মাছের জন্য অত মার খেলি…

মাণিক আর কাঙ্গাল উভয়েই কাঁদিয়া ফেলিল। কাঁদিতে কাঁদিতে কি যেন বলিবে—বাধা দিয়া সোনা কহিল—শুধু শুধু কাঁদিস কেন ? সুধী-দা দিচ্ছে যখন, ভয় কি—নিয়ে যা।

সোনার কথায় অভয় পাইয়া দু'জনের মুখ আহ্লাদে ভরিয়া উঠিল, আর একবার সুধীন্দ্র এবং সোনার দিকে চাহিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দাঁড়াইল—তারপর মাছ লইয়া চলিয়া গেল।

গিরিশ ন্দ্র এতক্ষণ একটি কথা বলেন নাই, এবারে ঈষৎ হাসিয়া তিনি কহিলেন,—জমিদারী রক্ষা করতে হলে মনটাকে একটু কড়া করতে হয়, ভায়া। চোখে দু ফোঁটা জল দেখলেই গলে যেতে নেই !

হাসিয়া সুধীন্দ্র কহিল—মানি গিরিশ-দা, কিন্তু সময় এবং অবস্থা-বিশেষে নরম হলেই কাজ পাওয়া যায়, তুমিও তা অস্বীকার করবে না বোধ হয় !

গিরিশচন্দ্র কোন কথা বলিলেন না—গম্ভীর হইয়া স্নান করিলেন, এবং স্নানান্তে চলিয়া গেলেন তেমনি গম্ভীর মুখে।

গিরিশচন্দ্রের ভাব দেখিয়া সোনা অনেকখানি দমিয়া গিয়াছিল, সুধীন্দ্রের সহিত আলোচনায় যোগ না দিয়া সে আস্তে আস্তে কলসীতে জল ভরিতে লাগিল, সুধীন্দ্র তখন চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না, কহিল—আজকাল তোমার নাওয়া খুব তাড়াতাড়ি হয়—না, সোনা ?···জলে নাম্‌তে না নাম্‌তেই ?

সুধীন্দ্রর দিকে চাহিয়া সোনা বলিল—মনে হয় গিরিশ-দা মনে খুব দুঃখ পেয়েছেন ! দেখ্‌লে না কিরকম গম্ভীর হয়ে চলে গেলেন !

হাসিয়া সুধীন্দ্র কহিল—একখানা ভাঙ্গা ইট পর্য্যন্ত যেন ওঁর গায়ের রক্ত !···কিন্তু ভয় নেই, আমি ওঁকে বুঝিয়ে বলবো।

হাতের কলসী একটু ঠেলিয়া দিয়া, সোনা আকণ্ঠ জলে গিয়া একটা ডুব দিল, তারপর মাথা তুলিয়া কহিল—মার মুখে গিরিশ-দার সে দিন যে সব গল্প শুন্‌ছিলুম সুধী-দা—

সুধীন্দ্র ঝাঁ করিয়া পুকুরের মাঝামাঝি পাঁচ-হাত দূরে ভাসিয়া গিয়া জোর গলায় বলিল—চলে যেয়ো না সোনা! চার-কাঠিটা ভাল করে বেঁধে রেখে আমি আসছি।

অকস্মাৎ দম্‌কা ঝড়ের মত অতীতের একরাশ স্মৃতি সোনার বুকে দোলা দিল।

···একদিন এই গিরিশচন্দ্রের পিতা তাহাদের বাড়ীর ম্যানেজার ছিলেন—সে আজ কত দিনের কথা! আজ সে-সব স্বপ্ন বলিয়া মনে হয়।

সরল বিশ্বাসে সোনার স্বর্গগত পিতা যখন এক বন্ধুর হাতে বিস্তীর্ণ জমিদারী দেখাশুনার ভার দিয়া রোগশয্যায় পড়িয়াছিলেন, তখন তিনি জানিতেন না, এ-জগতে বন্ধুর স্নেহ-মমতা আদর-সোহাগ যা কিছু ঐহিক, নির্ব্বিচারে অর্থের গোলামি মানিয়া লইতে তা এতটুকু দ্বিধা রাখে না! নহিলে বন্ধু হইয়া সর্ব্বনাশের ফাঁশির ডুরিটুকু বন্ধুর কাছে তিনি দু'হাত পাতিয়া ভিক্ষা চাহিতেন না।

জমিদারী হইতে সুরু করিয়া অস্থাবর সম্পত্তি পর্য্যন্ত যখন হাতছাড়া হইয়া গেল, তখন পিতৃহারা সোনা মাতৃক্রোড় আশ্রয়

করিয়া এক রকম ভিখারীর কন্যার মতই···আজ এখানে, কাল সেখানে আশ্রয় চাহিয়া ফিরিয়াছে!···গিরিশবাবুর পিতা তখন মন-ভঙ্গে স্বাস্থ্যহীন, মৃত্যু-পথ-যাত্রী!

······অবশ্য সোনার কাছে এ সব কথা কাহিনীর মত মনে হয়! কেননা তাহার বাল্যজীবনের এই ঝড়-ঝাপ্টার সাড়া অধুনা তরুণ মনের স্মরণ শক্তিকে সজাগ করিতে পারে না।···কতদিন মায়ের কাছে এ সব কথা শুনিয়া সে চোখের জল রোধ করিতে পারে নাই।

কিন্তু গিরিশবাবুর ঐকান্তিক চেষ্টায় যখন তাহাদের হৃত সম্পত্তি পুনরায়ত্ত না হইলেও, বিশিষ্ট আত্মীয় এবং পিতৃবন্ধু হরগোপাল বাবুর হাতে আসিল, তখন হইতে সোনা নিজের জ্ঞান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের আশ্রয় বা সম্পত্তিহীনা বলিয়া ভাবিতে চাহিত না।—সুধীন্দ্রর পিতা হরগোপালবাবু এই দুঃস্থ পরিবারটিকে আপনার ভাবিয়া এমন স্নেহের চক্ষে দেখিতেন! তা' ছাড়া সুধীন্দ্রর আদর স্নেহ ভালোবাসা বর্ণনা করিবার ভাষা নাই! এই স্নেহবৎসল সাথীটিকে সোনা যে কি মুহূর্ত্তে তাহার বাল-সুলভ দৃষ্টিতে দেখিয়াছিল, তাহা অনুভব করিতে সে নিজে পুলকাবেশে স্পন্দিত হইত!

···সুধীন্দ্রর চার-কাঠি বাঁধা শেষ হইলে সে পুকুরে সাঁতার কাটিল; তারপর সোনার খুব কাছাকাছি আসিয়া, ভাসমান কলসীটা বুকে দিয়া হাসিতে হাসিতে কহিল—মনে আছে সোনা, সেদিন যা বলেছি?—সাঁতার দেওয়া খুব ভালো···মনে আছে?

মৃদু হাসিয়া সোনা পরনের কাপড় সামলাইতে সামলাইতে কহিল, মনে আছে সুধী-দা ! তা বলে আমি এখন সাঁতার কাট্‌তে যাচ্ছি না ! কত বেলা হলো—দেখেছো !…দাও আমার কলসী—

সুধীন্দ্র কলসী ছাড়িল না—কলসীটাকে দুহাতে আরো গভীর জলে ঠেলিয়া দিয়া বলিল—নাও তোমার কলসী সাঁতার দিয়ে এগিয়ে গিয়ে—সব কাজে অভ্যাস না রাখলে কিছু ঠিক থাকে না সোনা !…সাঁতারে অভ্যাস তুমি মোটে রাখছো না।

সোনার মন কিন্তু আজ অন্য দিনের মত সুধীন্দ্রর সাহচর্য্য পাইয়া তেমন উৎসাহ-মুখর ছিল না। বেচারী কাঙ্গাল আর মাণিককে এভাবে নির্য্যাতিত হইতে দেখিয়া, তাহার মনটা ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে,—একটা গোপন অভিমানও মাথা খাড়া করিয়া উঠিতেছে—গিরিশচন্দ্রের চরিত্রের নীরস শুষ্ক দিক্‌টা ভাবিয়া, হঠাৎ সে প্রশ্ন করিল—আচ্ছা সুধী-দা, আগে যেখানে তোমাদের বাড়ী ছিল, সেখানকার কথা মনে আছে ?

কলসীটা টানিয়া আনিয়া তাহার দিকে বাড়াইয়া দিয়া সুধীন্দ্র কহিল—এত যত্ন করে তোমাকে লেখাপড়া শেখালুম সোনা, কিন্তু সব মিথ্যা হলো ! ওরে পাগ্‌লী, নিজের দেশের কথা কেউ কখনো ভুল্‌তে পারে ?

সোনা কহিল—কিন্তু তখন তুমি খুব ছোট ছিলে তো সুধী-দা !…সব কথা—

সুধীন্দ্র বলিয়া উঠিল—আমার জ্ঞান হয়ে যা দেখেছি, তার অনেক মনে আছে…মস্ত বড় পূজার দালান, কাছারি-বাড়ী তালপুকুর, তালগাছে বাবুই পাখীর বাসা—

কলসীটা কাঁখে তুলিয়া সোনা কহিল—ওঠো জল থেকে—আবার বিষ্টি নাম্‌বে। হ্যাঁ, কি বল্‌ছিলে—বাবুই পাখীর বাসা? …পাখীর ছানা পেড়ে খুব আছাড় দিতে—এঁ্যা?

মাথা মুছিয়া সিঁড়ির দু'তিন ধাপ্ উপরে উঠিয়া সুধীন্দ্র বলিল—একদম্ না! সব চেয়ে মনে পড়ে দামোদরের বানের কথা! নদীর কাছাকাছি আমাদের বাড়ী ছিল—উঃ, দুটো দিন নৌকোতেই কেটেছে।

…তেমাথা পথের মোড়ে আসিয়া সোনা বলিল—বিকেলে আর কোথাও বেরিয়ো না সুধী-দা!…চরকা তৈরীর পরামর্শ মনে আছে?—

সুধীন্দ্র কহিল—যে আজ্ঞে।

সোনা ঈষৎ হাসিল, কোনো কথা বলিল না।……তখন ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি সুরু হইয়াছে।



তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বৈকালের দিকে সব কাজ ছাড়িয়া সোনা ঘরের দাওয়ায় বসিয়া আছে। সুধীন্দ্রর প্রত্যাশায়, ছোট খাটো প্রত্যেকটি শব্দে সে অধীর চোখে দ্বারের দিকে তাকায়। শৈশব হইতে আজ পর্য্যন্ত সুধী-দার সাহচর্য্য সোনার এত ভালো লাগে যে এই রতনগড় গ্রামের দু-চারজন সমবয়সী মেয়ে ছাড়া আর কাহারো সঙ্গে মিশিবার সে সময় পায় না এবং মিশিবার ইচ্ছাও নাই। তলাইয়া না দেখিলেও কিশোর মনে সুধীন্দ্রর আসন বেশ কায়েমি হইতেছে, ইহা সুধীন্দ্রর মা এবং সোনার মা দুজনেই বুঝিয়াছেন।···অবশ্য সুধীন্দ্রর দিক্ দিয়াও বলা চলে, সে কিছু বোঝে।

এ রকম ঘটিবার কারণও ছিল। সোনার মা আর সুধীন্দ্রর মা এক-গ্রামের মেয়ে। ছেলে বেলা হইতে দুজনের সখিত্ব নিবিড়—পরস্পরে ফুল পাতাইয়াছেন। সোনার বাপের সম্পত্তি রক্ষায় অক্ষমতা জানিয়া হরগোপালবাবু স্ত্রীর অনুরোধে, সে সব খরিদ করিয়াছিলেন। সোনা ও সুধীন্দ্রকে এক করিয়া রাখিবার ইচ্ছা সুধীন্দ্রর মায়ের অনেক দিন হইতেই ছিল। তারপর এই দুটি বালক-বালিকা একসঙ্গে বাড়িয়া উঠিয়াছে —দুজনে দুজনকে একান্ত আপনার বলিয়া ভাবিয়াছে।

···শ্রাবণের সন্ধ্যা। অস্ত-সূর্য্যের শেষ রশ্মিটুকু সুমুখের বড় নারিকেল গাছের মাথায় উঠিতেছে। সোনা উঠিল। অভিমানের নিশ্বাস কিছুতে সে রোধ করিতে পারিল না।

কদিন হইতে সোনার মায়ের শরীর ভালো নয়—রান্নাঘরের ছোট উঠানে বসিয়া তিনি পৈতা তৈরী করিতেছেন ; সোনাকে উঠিয়া বাহিরে যাইতে দেখিয়া কহিলেন—সন্ধ্যে হয়ে এলো সোনা—এখন আর বেরুস্‌নে। ঘরে দোরে জল দেওয়া, তুলসী তলায় প্রদীপ দেওয়া আছে।

গুম্ হইয়া সোনা খানিকক্ষণ দাঁড়াইল, তারপর যতখানি গম্ভীর হওয়া যায়, হইয়া ছোট পিতলের কলসীটা কাঁখে তুলিয়া খিড়কীর দিকে চলিল। মা শুধু একটা নিশ্বাস ফেলিলেন।

···সুধীন্দ্র বাড়ী ঢুকিয়া দু তিন সের একটা রুইমাছ উঠানে ফেলিয়া বলিল—তোমার অসুখ আর তুমি পৈতে তুল্‌ছো ফুলমা।···ওঠো! আমি ধরে দিচ্ছি ওগুলো—

'ফুলমা' শশব্যস্তে বলিয়া উঠিলেন—"ওরে না, তোর আঁশ-হাত···ছুঁস্‌নে রে—

অপ্রতিভ হইয়া সুধীন্দ্র দু পা পিছাইয়া আসিল, কহিল —ভুলে গেছলুম্ ফুলমা!···আজ পয়লা নম্বরে মাছটা ধরেছি— সোনা কোথায়?···রাত্তিরে তাকে মাছ রাঁধতে হবে। আমি, গিরিশদা, রবীন···আমরা কজনে এখানে খাবো।

কলসী কাঁখে খিড়কীর দরজাটা ভিতর হইতে বন্ধ করিতে করিতে সোনা বলিয়া উঠিল—সোনার দায় পড়েছে! পারবো

না আমি মাছ রাঁধতে !—কখন থেকে বসে রয়েছি ওঁর জন্য ! কি হচ্ছিল এতক্ষণ তোমার···শুনি ?

সুধীন্দ্র সগর্ব্বে মাছটার দিকে অঙ্গুলি তুলিয়া দেখাইল, কোনো কথা বলিল না। তারপর সোনার রাগ ভাঙাইতে সে বলিল—সন্ধ্যার সময় তুই রান্না চাপাবি আর আমি আলু ছাড়াতে ছাড়াতে চরকার কথা কইবো।—রাগ ক'রিসনে রে ! ···কি, রাজী তো ?

মৃদু হাসিয়া সোনা কহিল—আমার কি ! হলে তোমাদের জমিদারীর ভালো।···সেদিন হেম নন্দরাণী মনোরমা সবাই বলছিল—চরকা পেলেই রীতিমত শিখতে সুরু করে।

মাছটার দিকে চাহিয়া সুধীন্দ্র কহিল—তাহ'লে কি করা যাবে ?···এখনি মিস্ত্রী ডাকবো কাঠ কাটাতে ?

সোনা কহিল—মাছটার পানে চাইছো কেন সুধী-দা ? বেশ, তোমার কথা থাকবে। সন্ধ্যা বেলায় পরামর্শ হবে। কিন্তু অন্যবারের মত এবারো হচ্ছে বলে কলকাতা পালালে চলবে না।

সুধীন্দ্র বলিল—না রে না—এবারে তুই খাতিরজমা বসে থাক।

সোনা কাপড় ছাড়িয়া সন্ধ্যাপ্রদীপ তৈরী করিতে করিতে কহিল—গিরিশদাকে বলা হয়েছে তো ?

সুধীন্দ্র বঁটি পাড়িয়া মাছ কুটিবার উদ্যোগ করিতেছিল, জবাব দিল—বলবো এখন,—কিন্তু কেমন করে আঁশ ছাড়াতে হয়, একবার দেখিয়ে দিবি ?

সোনা কহিল—ওসব রাখো তো—আমি করবো'খন। গিরিশদাকে বলে এসো কিন্তু আগে—ভুলে যাও যদি!

বঁটি ছাড়িয়া সুধীন্দ্র কহিল—বেশ, যাচ্ছি।

সোনা কহিল—হাতটা ধুয়ে যাও।

······সুধীন্দ্র চলিয়া যাইবার পর সোনা সন্ধ্যার নিত্যকাজ সারিয়া মায়ের কাছে আসিয়া কহিল—উনুনে আগুন দি—কি বলো মা?

মা বলিলেন—দে। নাহলে অনেক রাত হয়ে যাবে।

একটু থামিয়া মুখ নীচু করিয়া সোনা বলিল—আজ গিরিশ-দা বোধ হয় আমার উপর রাগ করেছেন।

মা বলিলেন—কেন?

সোনা ওবেলার মাছ ধরার ব্যাপার বলিল। শুনিয়া মা হাসিলেন, বলিলেন—তুই পাগল হয়েছিস! গিরিশ কখনো রাগ করতে জানে না—বিশেষ তোর উপর! তারপর একটা নিশ্বাস ফেলিলেন; নিশ্বাস ফেলিয়া আবার বলিলেন—গিরিশ ছিল বলেই ভিটেয় আজ এখনও সন্ধ্যে পড়ছে, আমরা নির্ভাবনায় খাচ্ছি পরছি! ওঁর বন্ধু যখন অবিশ্বাসী হয়ে সর্ব্বস্ব লুটে নিলে,—তখন এই গিরিশ না থাকলে কোথায় থাকতুম, কি যে হতো!

সোনা কহিল—আমার কিন্তু একটুও মনে পড়ে না মা!

তুই তখন নেহাৎ এতটুকুন!···ঐ গিরিশ না খেয়ে না

ঘুমিয়ে কত ছুটোছুটি করে যে ফুলদের দিয়ে রতনগড়ের জমিদারী কিনিয়ে দিয়েছিল।

সোনা মনে মনে বলিল—আর একদিনও গিরিশ-দার সঙ্গে রূঢ়তা করিবে না।

সুধীন্দ্রর আসিতে দেরী হইতেছে—সোনা উনুনে আগুন দিয়া মাছ লইয়া কুটিতে বসিল। মা রান্নাঘরের রোয়াকে বসিয়া মালা জপ করিতেছেন। মা অসুস্থ বলিয়া সংসারের প্রায় সব কাজ সোনা নিজের হাতে করে।

মাছ কুটিতে কুটিতে সোনা বলিল—আচ্ছা মা, গিরিশ-দার বাপের আমলেই আমাদের জমিদারী ঘুচে যায়, না?

মা ঘাড় নাড়িলেন।

সোনা আবার বলিল—গিরিশ-দাকে খুব কাজের লোক আর জানাশোনা বলেই বুঝি ফুলমারা ম্যানেজার করেছিলেন?

মা এবারও ঘাড় নাড়িয়া জানাইলেন—হ্যাঁ।

বাহির হইতে সুধীন্দ্র ডাকিল—আলোটা একবার ধরবে সোনা? বড্ড অন্ধকার।

সোনা তাড়াতাড়ি লণ্ঠন লইয়া উঠানে নামিতেই উপর দিকে চাহিয়া দেখে—আকাশ মেঘে অন্ধকার।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ঘটী না ডুবিলেও তালপুকুরের নাম যেমন লোকের মনে সম্ভ্রমের ভাব জাগাইয়া দেয়, সোনাদের তেমনি আর কিছু না থাকিলেও, গ্রামের আগেকার সে সম্মান একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। বাল্যকাল হইতেই নিজেকে গরীব ভাবিয়া সোনার গরীবের উপর এমন অনুকম্পা সহানুভূতি আপনা হইতে জাগিয়া উঠিয়াছে যে, সময় পাইলেই সে গাঁয়ের গরীব-দুঃখীদের ঘরে গিয়া তাহাদের তত্ত্ব লয়। তার ফলে ভদ্রঘরের চেয়ে, গরীব চাষা-ভূষোর মহলে তাহার আধিপত্য যেমন বেশী, তাহারা তেমনি তাহাকে খাতির-যত্ন করে এবং ভালোবাসে।

সেদিন মায়ের ব্রতের জন্য তাঁতীপাড়ায় ছোট একখানা লাল কাপড় আনিতে আসিয়া বালিকা সোনা পাড়ার ঘরে ঘরে ঘুরিয়াও একখানা কাপড় পাইল না—আশ্চর্য্য হইয়া একজন তাঁতীকে জিজ্ঞাসা করিল,—আগে তোমরা কত ভালো ভালো কাপড় তৈরী করতে, শুনেছি, এখন একখানা ছোট কাপড়ও করোনা—কেন ?

—আর দিদিমণি, সে দিন কি আর আছে ? বলিয়া হাবুর বাপ্ নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—তোমাদের রাজত্বের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সুখের দিনও চলে গেছে। এখানে আগে আমরা পঁচিশ-তিরিশ ঘর তাঁতী একদণ্ড ফুরসৎ পেতুম না, দিন-রাত

কাপড় বুন্‌তুম। ফী হপ্তায় তোমার বাবা গাঁয়ের যত ভদ্দর লোকদের নিয়ে দেখ্‌তে আস্‌তেন, সকলে কত কাপড় কিনে নিয়ে যেতেন, আমরা জুগিয়ে উঠতে পারতুম না। গাঁয়ের চার-দিকে চাষাদের সবাইকে কাপাসের চাষ করতে হতো, ঘরে-ঘরে ভদ্রঘরের মেয়েরা পর্য্যন্ত চরকা কাট্‌তো। সেই সব সূতো আমরা কিনে আন্‌তুম। এখন কাপাসের চাষও কেউ করে না, চরকাও কাটে না—সারা গাঁ খুঁজে এক-হাত সূতো কিন্‌তে পাওয়া যায় না, তা কাপড় বুন্‌বো কি, দিদি! এখন একখানা পাঁচ-হাত কাপড়ের দরকার হলে বাবুরা কেউ তাঁতীপাড়ায় আসে না, গঞ্জের বাজার থেকে কিনে আনে। কালে-ভদ্রে আমরা দু'চারখানা গামছা যদি বুনি, তাও আর গাঁয়ে বিকোয় না, গঞ্জে নিয়ে গিয়ে দোকানদারদের খোসামুদী করে আধা কড়িতে গছিয়ে আস্‌তে হয়। এই দেখো না, বলিয়া বৃদ্ধ ঘরের মধ্য হইতে দু'খানা লাল গামছা বাহির করিয়া আনিল, তারপর তার মাঝামাঝি ছিঁড়িতে-ছিঁড়িতে বলিল,—এই দু'-জোড়া গামছা বুনেছিলুম সেই চৈত্তির মাসে। সন্ন্যাসের সময় একজোড়া বিক্রি হয়েছিল, এ জোড়া সেই থেকে এমনি পড়ে আছে—বিকুলো না। এর একখানা নিয়ে গিয়ে, বেরতোর কাজ চালিয়ে নিতে বলো দিদি, কাপড় মিলবে না।

হাবুর বাপের কথা শুনিয়া সোনা যেমন আশ্চর্য্য হইয়াছে, তেমনি তার কৌতূহলও হইয়াছে খুব বেশী। অনেকক্ষণ ধরিয়া বৃদ্ধকে প্রশ্ন করিয়া অনেক কথা সে শুনিয়া লইল। এবং

শুনিয়া যাহা বুঝিল, মনে হইল, সে যদি গাঁয়ের মেয়েদের চরকা ধরাইয়া আবার ঘরে ঘরে তাহা চালাইতে পারে, তাহা হইলে গাঁয়ের দরিদ্র ভদ্র পরিবারের উপার্জ্জনের পথ হইবে যেমন, তেমনি গরীব তাঁতী আর চাষাভূষোদেরও খানিকটা হিল্লা হইবে।

বাড়ী ফিরিয়া অন্য কাজ করিতে সোনার ইচ্ছা হইল না। গরীব তাঁতীদিগের দুঃখের বিষয় ভাবিতে লাগিল। সুধীন্দ্রকে বলিল—আর দেরী করোনা সুধী-দা! এবার যদি না হয়, তা'হলে বুঝ্‌বো তুমি একটুও চেষ্টা করোনা!

সুধীন্দ্র বলিল—হঠাৎ এ কথা মনে হলো কেন?

হঠাৎ নয়, অনেক দিন থেকে মনে হয়েছে। বলিয়া সোনা তাঁতীপাড়া ভ্রমণের বিবরণ বলিল—বলিল,—হাবুর বাপের মুখে যা শুনেছি সুধী-দা; তাতে তুমি যদি ঘরে ঘরে চরকা চালিয়ে দিতে পারো, তা'হলে—

বাধা দিয়া সুধীন্দ্র কহিল—আমার একলার চেষ্টায় কি হবে? গাঁয়ের সবাই যদি চেষ্টা করে—

হবে, হবে—আমি বলছি, হবে—বলিয়া, সুধীন্দ্রকে কথা শেষ করিতে না দিয়া, সোনা উৎসাহভরে কহিল,—এই যে মেয়ে ইস্কুল করবে, তাতে শুধু বই না পড়িয়ে, যদি সব মেয়েদের চরকা কাট্‌বার নিয়ম করে দাও, তা'হলে সবাইকে কাট্‌তেই হবে।

এ সময়ে কলিকাতায় চরকা আন্দোলন সুরু হইয়া দেশ-বিদেশে কিরূপ দ্রুত ছড়াইয়া পড়িতেছিল, সুধীন্দ্রের অজ্ঞাত

ছিল না। সোনার মুখে তাহারই প্রতিধ্বনি শুনিয়া, তাহার বুক উৎসাহে ভরিয়া উঠিল। সে বলিল—যত শীগ্‌গির আমরা হুজুগে মাতি, তত শীগ্‌গির কাজ করতে পারি না—এ আমাদের বাঙ্গালীর অধঃপতনের মস্ত কারণ। এবার সত্যই কাজ করবো। তুই কালই তোর খেলুনীদের বাড়ী গিয়ে, কার ঘরে ক'টা চরকা আছে দেখে আসিস্।

সোনা কহিল,—সে আমি দেখেছি সুধী-দা, এক মনো-দিদিদের বাড়ীতে একটা ভাঙ্গা চরকা পড়ে আছে, তাতে পুরুত ঠাকুরের মা সময়ে-সময়ে পৈতে তোলবার জন্য সূতো কাটেন, তা ছাড়া কারো ঘরে একটাও নেই।

তা'হলে ?

সোনা কহিল—তা বলে চুপ করে বসে থাকা নয় সুধী-দা, কিছু খরচ করতে হবে, গোটা-কতক তৈরী করবার জন্য। আমার খেলুনীদের এখুনি একটা দাও—নাহলে কারও চাড় হবে না। গিরিশ-দাকে আমি কতদিন থেকে বলছি, তিনি খালি বলেন দেব—! মাণকের বাপ ভালো চরকা তৈরী করতে পারে, কিন্তু গরীব মানুষ—তার কাঠ নেই। সে বলেছে যে, বেনাপোলে তোমাদের যে শুক্‌নো কাঁঠাল-গাছটা আছে, সেটা পেলে সে অনেক চরকা করে দিতে পারে। গিরিশ-দাকে আমি বলেছিলুম—তিনি বলেন—না, অন্য গাছ দেবো,—কিন্তু দেন না। মাণকের বাপ বলে, ছোট মরা গাছ আর নেই, সব বড় বড় গাছ, তা কাটতে লোকসান হবে। গিরিশ-দাও তা বলেন, তবু গাছটা দেন না। শুনেছি, তিনি বলেন, শুধু শুধু কতক-

গুলো বাজে খরচ করে পরের পেট ভরানো হবে—কাজে কিছু হবে না।

ঈষৎ হাসিয়া সুধীন্দ্র কহিল—আমাদের স্বভাব তাই দাঁড়িয়েছে বটে, তবু চেষ্টা করতে হবে। নাহ্‌লে—হাল ছেড়ে দিলে কক্ষণো কিছু হয়ে উঠবে না। এতে কিন্তু খরচ হবে বলে পিছোলে চল্‌বে না। আচ্ছা চলো, গাছটা দেখে আসি আগে।

সেই দিনই দু'জনে সারা গ্রাম ঘুরিয়া, যেখানে যত গাছ আছে, দেখিল,—কিন্তু বেনাপোলের কাঁঠাল গাছ ছাড়া কাটিবার মত গাছ আর পাইল না। সুধীন্দ্র অম্লান বদনে মাণিকের বাপকে হুকুম দিল,—আজই এ গাছটা কেটে নিয়ে চরকা তৈরী সুরু করে দাও—শনিবারের মধ্যে গোটাচারেক যেন পাই।

একটু আম্‌তা আম্‌তা করিয়া মাণিকের বাপ কহিল—এজ্ঞে, এ গাছটা ছিদেম কলুকে বেচবেন বলে, ম্যানেজারবাবু দশ টাকা দাম বলেছিলেন, ছিদেম ছ'টাকার বেশী ওঠেনি তাই এখনো বিক্রি হয়নি। সে যদি আর দু'এক টাকা ওঠে?

সুধীন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল—বিক্রি তো এখনো হয়নি?

—এজ্ঞে না, তবে শুনেছি, ছিদেম নাকি আজ সন্ধ্যার পর গিয়ে আর কিছু বাড়িয়ে কিনে নেবে।

—আচ্ছা, সে যায় যাবে,—তখন কিন্তু গাছ আর থাকবে না। তাছাড়া দশ টাকার চেয়ে এ গাছে আমার ঢের বেশী টাকার কাজ হবে। নে—এখুনি তোরা বাপ-বেটা মিলে কাট্‌তে সুরু

করে দে। কেউ কিছু বল্লে, বলিস্—আমি কাট্‌তে বলেছি—আমার দরকার।

এ-কথা বলিয়া সোনার হাত ধরিয়া সুধীন্দ্র কোথায় কার্পাস চাষের ব্যবস্থা করিবে—দেখিতে গেল। মাণিক এবং মাণিকের বাপ কুড়ুল আনিয়া বড়বাবুর হুকুম তামিল করিতে লাগিয়া গেল।

বৃদ্ধ হাবুর বাপ এবং সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেকে আসিয়া জুটিল। ইতিমধ্যে ছিদাম কলুও ঘটনাস্থলে আসিয়া উপস্থিত। গাছের কথা শুনিয়া মুখখানা তার ভারী হইয়া উঠিল। তার'পর গাছটা যখন আধাআধি কাটা হইয়াছে, তখন আর অপেক্ষা করিতে পারিল না, তাড়াতাড়ি সে বাবুদের বাড়ীর দিকে ছুটিল।

মাণিকের বাপ কহিল,—ব্যাটা কলুরপো মুখখানা আঁধার করে বাবুদের বাড়ী চললো! বোধ করি, ম্যানেজার-বাবুর কাছে কেঁদে কেটে প'ড়বে।—আয় ভাই তোরাও একটু হাত লাগা, ও ব্যাটা ফিরে আসবার আগেই আমরা একেবারে সাফ ক'রে নিয়ে চলে যাই। কি জানি, ব্যাটা যদি কান্নাকাটি করে ম্যানেজার-বাবুকে সঙ্গে করে নিয়ে আসে?

কাঙ্গালের বাপ বলিল,—আন্‌লোই বা,—বড়বাবু যখন বলে গেছেন—

—না রে বুঝিস না, বড়বাবু আর সোনাদি এখনো হয়তো নদীর ধারে ক্ষেত দেখে বেড়াচ্ছে—বাড়ী ফেরেনি। ম্যানেজার-বাবু এসে যদি বলে, আমি আগে থাক্‌তে বেচে রেখেছি! কাজ

কি অত ফ্যারাক্কাতে। একেবারে সাফ করে দিয়ে আয়, গাছটা ঘরে নিয়ে গিয়ে চির্‌তে সুরু ক'র দিই। তখন ইচ্ছা থাকলেও আর কিছু করতে পারবে না।"

পল্লীর সকলে মিলিয়া তখনি আধ ঘণ্টার মধ্যে গাছটাকে নির্ম্মূল করিয়া যে যার কাজে চলিয়া গেল।

মাণিকের বাপের অনুমান মিথ্যা হইল না। ঘণ্টাখানেক পরে গিরিশ মিত্তির আসিয়া যখন উপস্থিত হইলেন, তখন আরও জন দুই লোকের সঙ্গে মিলিয়া মাণিকের বাপ গাছটাকে চিরিয়া দুখানা তক্তা বাহির করিয়া ফেলিয়াছে।

গিরিশবাবু ছিদামকে কহিলেন,—"আর কি করবো! তোমার বরাত কলুর পো! দশটা টাকা দিতে যেমন কিন্তু করছিলে, তেমনি হলো! যদি আর ঘণ্টাখানেক আগে জানাতে!"

কলুর পো নিরাশ হইয়া ফিরিয়া গেল। তারপর গিরিশবাবু জেরা করিয়া একে একে সকল কথা শুনিয়া গৃহের দিকে ফিরিলেন—তাঁহার মুখখানা বেশ থমথমে। কিন্তু পরক্ষণেই মেঘের কোলে বিদ্যুতের মত যে একটু হাসি ফুটিল, সে হাসি কাহারো দৃষ্টি এড়াইল না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

দিন চারেক পরের কথা। সোনার কথায় পাড়ায় পাড়ায় মেয়েদের কাছে এবং সোনার সখী হেমাঙ্গিনী মনোরমা আর নন্দরাণীর কাছে চরকা ক'টা আসিল। পরের দিন কাণাঘুষায় এ খবর গিয়া হরগোপালবাবুর কাণে পৌঁছিল। আশ্চর্য্য হইয়া গিরিশচন্দ্রকে ডাকিয়া তিনি বলিলেন, "গাঁয়ের মেয়েরা নাকি চরকা কাট্‌তে সুরু করেছে!"

গিরিশচন্দ্র বলিলেন,—"কৈ, আমি তো শুনিনি। তবে সুরু যদি করে থাকে তো ভালোই! শুনেছি, সুধীন আর সোনা এরা দুজনে ক'টা চরকা তৈরী করিয়ে ক'জন মেয়েকে দিয়েছে।"

মনে মনে খুশী হইয়া হরগোপাল কহিলেন, "হুঁ! দুজনে এমন বাহাদুর হয়েছে! বাঃ!"

গিরিশচন্দ্র বলিলেন—"সোনার চেষ্টাতেই সুধীনের উৎসাহ। এ সব দিকে দু'জনের নজর খুব—নজর নেই শুধু নিজেদের দিকে।"

"কেন? এতে অন্যায়ের কি আছে?"

"আজ্ঞে, অন্যায়—চরকা চালাতে পারলে এষ্টেটের লাভ আছে। আমার কিন্তু সে আশা নেই। দুদিনের হুজুগ শুধু। পরে দেখবো চরকাগুলো পড়ে গড়াগড়ি যাচ্ছে—সখ গেছে মিটে! তখন এ খরচাটা হবে বাজে, পয়সাগুলো স্রেফ জলে ফেলা।"

হো হো করিয়া হাসিয়া হরগোপালবাবু কহিলেন—"সুধীনের সখ, সখে খরচ তো লাগবেই গিরিশ !"

গিরিশচন্দ্র ঈষৎ অপ্রতিভ হইলেও বলিলেন, "না ! আমি তা বলছি না। সখের জন্য খরচ করবে বৈ কি--নিশ্চয় করবে, বিশেষ সর্ব্বস্বই যখন তার ! আমার বলার উদ্দেশ্য--কাল বেনাপোলের যে কাঁঠাল গাছটা কেটে ওরা এত চরকা তৈরী করিয়েছে, সে গাছটা কিনবে বলে ছিদাম কলু দশটা টাকা নিয়ে আমার দোরে হত্যা দিয়ে পড়েছিল ক'দিন। দশ দশটা টাকা লোকসান হলো তো খেয়ালের জন্য। ও গাছটা না কাটিয়ে অন্য দশটা গাছ কাটালে পারতো।"

এই জমিদারীর উপর তরুণ ম্যানেজারের কতখানি অন্তরের টান, তাহা সকলেই জানে। বাল্যকাল হইতে সোনাদের গৃহে মানুষ—সোনার বাপের সঙ্গে বিষয় সম্পত্তি নাড়াচাড়া করিতেন বলিয়া এ-সব সম্পত্তি তাঁহার অস্থিমজ্জায় এমন মিশিয়া আছে যে, গিরিশচন্দ্র মুহূর্ত্তের জন্য পরের সম্পত্তি বলিয়া মনে করেন না। এ কথা জানেন বলিয়াই প্রবীণ হরগোপাবাবু এই যুবককে এ জমিদারীর ম্যানেজার করিয়া তাঁহারই হাতে সব ভার দিয়া নিশ্চিন্ত আছেন। গিরিশচন্দ্রের কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন—"এ্যাঁ ! সেই কাঁঠাল গাছটা কাটিয়ে চরকা করালো ?"

—"তাছাড়া অত বড় গাছটা ! তবু আমি বেচতে চেয়েছি শুনে সুধীন প্রথমে ও গাছটায় হাত দিতে চায়নি—আর একটা গাছ কাটাতে গেছলো। কিন্তু সেটার দাম আরো বেশী বলে, সোনা জিদ করে ওই মরা গাছটাই কাটিয়েছে।"

হঠাৎ একটা গোপন অভিলাষ গিরিশচন্দ্রের মনের মধ্যে মাথা ঠেলিয়া উঠিল। একটু থামিয়া পরে আপনা আপনিই তিনি বলিলেন—"সোনার গুণ ঢের—ছেলেবেলা থেকেই দেখছি তো! যেমন বুদ্ধি-শুদ্ধি, বিষয়-সম্পত্তির উপর তেমনি টান!"

হরগোপালবাবু শুধু 'হুঁ' বলিয়া কেমন যেন আনমনা হইলেন। একটা কথা তাঁহার মনে কাঁটার মত খর্‌খর্ করিয়া উঠিল। সুধীন্দ্রর সহিত সোনার বিবাহ দিবেন বলিয়া গৃহিণী সোনার মাকে স্পষ্ট প্রতিশ্রুতি দেন নাই, তবু সোনার ভার লইলেন বলিয়া যেটুকু আশ্বাস দিয়াছিলেন, তাহাতে ও কথাটা আঁচ করিয়া লইতে কাহারও বাধে নাই। কথা যে উদ্দেশ্যেই গৃহিণী বলুন না কেন, ওই মেয়েটিকে পুত্রবধূ করিবার বিশেষ আগ্রহ আছে গৃহিণীর মনে, হরগোপালবাবু তাহা বোঝেন। তাই এ বাড়ীতে সোনার আদর-যত্ন এবং আধিপত্য যেমন বাড়িতেছে, তেমনি কর্ত্তা ও গৃহিণী দু'জনেরই মনের টান একটু একটু করিয়া সোনার উপর না পড়িতেছে এমন নয়। সর্ব্বোপরি সুধীন্দ্র ও সোনার এই এত মাখামাখি, গিরিশচন্দ্রের এ কথায় আরো যেন স্পষ্ট হইয়া হরগোপালের চোখের সামনে প্রকাশ পাইল।

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া হরগোপালবাবু কহিলেন,—"তাইতো গিরিশ, আমি এখন উভয় সঙ্কটে পড়েছি যে।" এইটুকু বলিয়া তিনি কি চিন্তা করিতে লাগিলেন। গিরিশচন্দ্র সবিস্ময়ে তাঁহার পানে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

হরগোপালবাবু ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন,—"ব্যাপার যা দাঁড়াচ্ছে, তাতে দু'জনের বিয়ে দিলেই যেন সব দিকে ভালো হয়। কিন্তু—"

গিরিশচন্দ্র কহিলেন—"আর সকলে চায়ও তাই! এতে কিন্তু করছেন কেন? বরং আদেশ করুন, একটা শুভদিন দেখিয়ে—"

হরগোপালবাবু গম্ভীরভাবে বলিলেন, "নদের রামদাস বাবুকে মনে পড়ে?"

—"নিশ্চয় পড়ে। সেবার কাশীতে তার জন্য আপনাকে ফিরে পেয়েছিলুম? নাহলে কি সর্ব্বনাশ হতো ভাবতে গা শিউরে ওঠে। তাঁর ঋণ শোধ হবার নয়।"

"শোধা যায় গিরিশ। আর শুধু তাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে হাজার দশেক টাকা ঘরে আসে।"

হরগোপালবাবু নিঃশব্দে একখানি চিঠি বাহির করিয়া গিরিশচন্দ্রের হাতে দিলেন, কহিলেন,—"পড়ে ছাখো! আজ ছ'মাস লেখালেখি চলেছে। তোমরা কেউ জানো না! কিন্তু আর চুপ করে থাকা চলে না তো!"

গিরিশচন্দ্র চিঠিখানা পড়িলেন, পড়িয়া কর্ত্তার হাতে ফেরত দিলেন। তাঁহার ললাট কুঞ্চিত। তিনি বলিলেন, "কিন্তু এদিকে—খুড়িমা এতকাল গিন্নীমার কথাতে—"

হরগোপালবাবু কেমন উন্মনা ছিলেন—ঈষৎ নির্লিপ্ত কণ্ঠে তিনি বলিলেন, "উনি তোমার খুড়ী-মাকে এমন কথা বলেননি নিশ্চয় সুধীর সঙ্গে সোনার বিয়ে দেবেন!—সোনার সব ভার

নিয়েছেন—সে ভার তো আমরা ত্যাগ করছি না। আমাদের 'ফুলের' মেয়ে—আমাদেরও মেয়ের মত। তার উপায় এমন করে দেবো যে, এখন সে যেমন আছে, তার চেয়ে আরো বেশী হবে আমাদের আপনার। আর, তার বাপের কি ইচ্ছা ছিল, তাও আমার অজানা নেই।”

নিশ্বাস ফেলিয়া গিরিশচন্দ্র বলিলেন, “আপনার যা ইচ্ছা হবে অবশ্য তা করবেন। তবে সুধীন—”

ঈষৎ হাসিয়া হরগোপালবাবু কহিলেন—“শুধু সে কেন—তোমার গিন্নী-মা পর্য্যন্ত গোলমাল করবেন, আমি তা বুঝি। তাঁদের কি! তাঁরা শুধু আমোদ-আহ্লাদ ভাব-সাবই চিনেছেন—কিন্তু তুমি বলো গিরিশ, এই দশ হাজার টাকা—এ কি সহজ কথা! এখন আমি কাকেও কিছু জানাবো না। রামদাস বাবুরা কলকাতাতেই আছেন। সুধীও ক'দিন পরে কলকাতায় যাবে। বাড়ীর কেউ জানবার আগেই, কৌশলে সেখানে উভয় পক্ষের আশীর্ব্বাদের কাজ চুকিয়ে ফেলতে হবে। তারপর সাম্‌নের অগ্রাণ মাসে···আগে সোনার শুভ কাজটা চুকিয়ে দেওয়াই ভালো—তারপর সুধীনের বিয়ের কথা প্রকাশ করা। তুমি এখন থেকে তৈরী থেকো গিরিশ।”

গিরিশচন্দ্র মাথা নাড়িয়া সায় দিয়া নিঃশব্দে চলিয় যাইতেছিলেন, হরগোপালবাবু তাঁহাকে ডাকিলেন, কহিলেন—“আমার বিশ্বাস, তুমি আমাকে বাপের মত মানো—তোমার মঙ্গল বুঝে আমি যা করবো, ভালো-মনে নিতে তোমার কোনো বাধা বা আপত্তি থাকতে পারে না।”

কথাটার মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে গিরিশচন্দ্রের বিলম্ব হইল না। আনন্দে বাক্‌নিষ্পত্তি না করিয়া নিঃশব্দে মনিবের পদধূলি মাথায় লইয়া ধীরে ধীরে তিনি প্রস্থান করিলেন।

কিন্তু বিজ্ঞ হরগোপালবাবু যে মতলব আঁটিলেন, তাহা হাসিল করা সহজ নয়।

পূজার ছুটি আসন্ন। কলিকাতার বাসায় পরিচিত পিতৃবন্ধুর সহিত অপরিচিত দু'জন ভদ্রলোককে আসিতে দেখিয়া সুধীন্দ্র বিস্মিত হইল—আদর অভ্যর্থনায় ত্রুটি রাখিল না। বৈকালে প্রস্থানের পূর্ব্বে অপরিচিত ভদ্র ব্যক্তিদের একজন তাহার মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করার সঙ্গে সঙ্গে একসেট্ হীরার বোতাম হাতে দিতে সে সবিস্ময়ে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। মনের মধ্যে নানা কথা, নানা চিন্তা—তাঁহাদের এ জিনিস তো সে চাহে নাই। তবে?

হতভম্বের মত সে সুমুখের চেয়ারে বসিল—বসিতে ধান-দূর্ব্বা মাথা হইতে ঝরিয়া পড়িল দেখিয়া তাহার মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত ঝিম্‌ঝিম্ করিয়া উঠিল।

দুদিন পরে পূজার ছুটি—সুধীন্দ্র বাড়ী গেল না—কলিকাতায় রহিল।

আশীর্ব্বাদের ব্যাপার গ্রামের কাহারও শুনিতে বাকী রহিল না। পূজা সেবার কার্ত্তিক মাসে। সোনার মা ঘুষঘুষে জ্বর এবং কাসিতে ভুগিতেছিলেন। হঠাৎ তিনি শুনিলেন, সুধীন্দ্র কোথায় চলিয়া গিয়াছে—কাহাকেও কিছু না বলিয়

কোথায় গেল, কেন গেল, কেহ তা জানে না। এ খবর শুনিয়া তিনি আর আপনাকে খাড়া রাখিতে পারিলেন না। যেভাবে তিনি শয্যা গ্রহণ করিলেন, তাহা দেখিয়া মেয়ে কাঁদিতে কাঁদিতে জমিদার-গৃহিণীর কাছে ছুটিয়া আসিল, কহিল, "মার যা হয়েছে, আমার ভয় করছে ফুল-মা।"

জমিদার-গৃহিণী শিহরিয়া উঠিলেন! তিনি স্তম্ভিত! শুনিলেন—একাদশীর রাত থেকেই এমন জ্বর যে, সেই থেকে বেহুঁশ! তার উপর আজ কাসির সঙ্গে যেন রক্তের ছিটে! বলিলেন—"এ দু'দিন খবর দিস্‌নি কেন?"

সোনা সে কথার জবাব দিতে পারিল না, ঘাড় নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া পায়ের নখ দিয়া মাটি খুঁড়িতে লাগিল। একাদশীর দিনই সুধীন্দ্রর নিরুদ্দেশের কথা রাষ্ট্র হইয়াছে, সে কথা মনে পড়িতে জমিদার-গৃহিণী সোনার মুখের পানে চাহিলেন। সোনা ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া ধরা-গলায় বলিয়া উঠিল,—"কি হবে ফুল-মা?"

ফুল-মারও চোখ সজল—নিজেকে সামলাইয়া লইয়া, সান্ত্বনা দিবার ছলে তিনি কহিলেন—"ভাবিসনে মা, জগদম্বা আরাম ক'রে দেবেন। তুই গিয়ে তাঁর কাছে বোস—আমি এখনি যাচ্ছি।"

কত বড় আঘাত সোনার মাকে পাড়িয়া ফেলিয়াছে, জমিদার-গৃহিণী তাহা বুঝিলেন। সুধীন্দ্রকে আশীর্ব্বাদ করানোর কথা শুনিয়া অবধি ক্ষোভে, লজ্জায় এবং মনোবেদনায় তিনি দু'দিন ধরিয়া ফুলের কাছে মুখ দেখাইতে পারেন নাই। তার

উপর পূজার ছুটীতে ছেলে বাড়ী আসিল না—সে আঘাত! তাঁহার বুকের ভিতরটা ভুমড়াইয়া ভাঙ্গিয়া গিয়াছে যেন! দু'দিন সহস্র কাজের মধ্যেও তিনি নির্জ্জনে চোখের জলে দেবতার চরণে মর্ম্মবেদনা নিবেদন করিতেছেন। সোনার কথায় নিজেকে আর খাড়া রাখিতে পারিলেন না। ছোট ছেলে রবীন্দ্রকে কবিরাজের কাছে পাঠাইয়া তিনি আসিয়া সোনার মার শয্যার পাশে বসিয়া স্খলিতকণ্ঠে ডাকিলেন—"ফুল!"

জমিদার-গৃহিণী তাঁহার হাত দু'টি ধরিয়া, চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে কহিলেন,—"মেয়েমানুষের জন্মই মিথ্যা ফুল—তার কোনো সাধ মেটে না। আমরা শুধু কলের পুতুলের মত পরের হাতে খেলনা, ভাই!"

সোনার মা ধীরে ধীরে নিজের একখানি হাত কপালে ঠেকাইয়া শিথিল কণ্ঠে কহিলেন—"আমার কপাল! তুমি আর কি করবে! আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে—যে কদিন থাকি এক-একবার এসো। তুমিও আমাদের ভুলে থেকো না!"

জমিদার-গৃহিণী জবাব দিতে পারিলেন না, বাল্য সখীর কথায় যে আঘাত মনে লাগিল, তাহার ক্ষত শুকাইবার নয়!

হরগোপাল সোনার মার চিকিৎসার ত্রুটি করিলেন না, জমিদার-গৃহিণী নিজের ঘর-সংসার ফেলিয়া দিবারাত্রি রুগ্নার শয্যাপার্শ্বে থাকিয়া স্বহস্তে যে ভাবে সেবা-শুশ্রূষা করিলেন, পাড়ার লোক আশ্চর্য্য হইয়া গেল। কিন্তু পীড়ার উপশম নাই। কার্ত্তিকের অবসানের সঙ্গে কবিরাজ হতাশ হইয়া বলিলেন,—

"আমাদের আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে এ রোগের আর চিকিৎসা নেই, এখনকার চিকিৎসা তুলসীতলা।"

রুগ্নার রোগপাণ্ডুর মুখে ঈষৎ হাসির রেখা! হরগোপাল বাবু এবং তাঁহার পত্নী উপস্থিত ছিলেন। সোনার মা তাঁহাদের দিকে চাহিয়া ক্ষীণকণ্ঠে কহিলেন—"মরণে আমার আক্ষেপ নেই! শুধু মেয়েটা—"

তাঁহার মনের কথা অনুমান করিয়া হরগোপাল আশ্বাস দিলেন,—"সোনার ভাবনা একবারও ভেবো না ফুল। আমাদের মেয়ে! ওর ভার অনেকদিন আগে থেকেই আমরা নিয়ে রেখেছি! ওর সব ব্যবস্থা আমি করে দেবো।"

দুই ফুল একসঙ্গে মুখের পানে চাহিলেন। হরগোপাল কহিলেন, "সয়ার' বরাবর ইচ্ছা ছিল, গিরিশের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবেন, মরবার সময় সে ইচ্ছা আমায় বলে গেছেন। সেই থেকে গিরিশকে আমার জমিদারীর সর্ব্বেসর্ব্বা করে রেখেছি! মা জগদম্বা করুন···শুভ কর্ম্মটা দেখে—"

সোনার মা ম্লান হাসি হাসিয়া কহিলেন, "আমার দেখা হবে না—ফুল রইলো, দেখবে। আমি শেষ-ডাক কানে শুনছি।"

সেই দিনই সন্ধ্যা হবার আগে সোনার মা ইহলোকের সব বন্ধন ছিন্ন করিয়া চলিয়া গেলেন। সোনা কাঁদিল না—কাঠ হইয়া বসিয়া আছে মায়ের বিছানায় মায়ের পানে চাহিয়া।

তারপর দুদিন সোনার কোনো চেতনা নাই! যাহা ঘটিয়া গেছে—সে যেন আচ্ছন্ন অবস্থা।

—তৃতীয় দিনে চোখ মেলিয়া সোনা উপলব্ধি করিল, সে শুইয়া আছে, সামনে বসিয়া ফুল-মা—তাঁহার পিছনে দাঁড়াইয়া গিরিশচন্দ্র। সোনা তার দুটি হাতে জমিদার গৃহিণীর গলা জড়াইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল,—"মা—মা—আমার মা!"

জমিদার-গৃহিণীর দু'চোখে শ্রাবণের ধারা—সান্ত্বনার সুরে তিনি কহিলেন—"এই যে মা আমি তোমার মা।"

চতুর্থ দিনে, সোনা সহজভাবে উঠিয়া বসিয়া মাতার পারলৌকিক কার্য্য সম্পন্ন করিল। হরগোপাল ও গিরিশচন্দ্রের চেষ্টায় গ্রামসুদ্ধ লোক পরিতৃপ্তিতে ভোজন করিল।

সব ব্যাপার চুকিয়া গেলে, তাহাকে সহসা পাকা গৃহিণীর মত নিজের ঘর গুছাইতে দেখিয়া গিরিশচন্দ্র স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া নিজের কাজে মনোনিবেশ করিলেন।



ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কত বড় আঘাতে সোনার ভিতরটা কিভাবে উলট-পালট হইয়া গিয়াছে, আর কেহ তাহা না বুঝিলেও জমিদার-গৃহিণী বুঝিলেন, এবং সে আঘাতের সমস্ত বেদনা সকলের অগোচরে অন্তরে বহিয়া অচিরে শয্যাশায়ী হইলেন। সোনা নিজের ঘর ফেলিয়া আসিয়া তাঁহার কাছে ঘেঁষিয়া বসিয়া আর্ত্তকণ্ঠে বলিল, "তুমিও তা'হলে চলে যাবে, ঠিক করেছো ফুল-মা?"

কৃত্রিম রোষে সোনাকে ধমক দিয়া ফুল-মা বলিলেন,—"চুপ করতো তুই, এর মধ্যে যেতে আমার বয়ে গেছে!"

স্খলিত কণ্ঠে সোনা বলিল, "সত্যি ফুল-মা, কারো অসুখ হলে আমার এখন এমন ভয় হয়। কেবলি মনে হয়—"

জমিদার-গৃহিণী তাহার মাথায় হাত রাখিয়া কহিলেন, "কাঁদিস নে মা—ছি, আমি কি বুঝি না, কি ব্যথা মনে নিয়ে তুমি—"

সোনার সর্ব্বাঙ্গ বহিয়া যেন বিদ্যুতের প্রবাহ ছুটিয়া গেল। তাড়াতাড়ি আত্মসম্বরণ করিয়া কথার স্রোত ফিরাইবার জন্য সে বলিল, "কোনো কথা আমি শুনতে চাই না ফুল-মা। তোমাকে সেরে উঠতে হবে।"

দু'জনের মনের কথা দু'জনেই টের পাইয়াছেন, তাহা পরস্পরের অজ্ঞাত রহিল না।

জমিদার-গৃহিণী কহিলেন, "আমার কি সাধ মা,—না, মানুষের এতে হাত আছে?"

সোনা সে কথায় কান না দিয়া মাথা নাড়িতে নাড়িতে কহিল, "না, না, তা হবে না! রবির কাছে শুনলুম, তুমি ওষুধ খাওনি; ওষুধ তোমায় খেতেই হ'বে। আমি আর এখান থেকে নড়'বো না। দেখি কেমন তুমি ওষুধ না খাও!"

রবীন্দ্র ঘরে ঢুকিয়া তিন-চারটি কাগজের মোড়ক সোনার হাতে দিয়া বলিল, "এতে লেখা আছে—কোন্ বড়িটা কখন কি দিয়ে খেতে হবে।"

ঈষৎ হাসিয়া গৃহিণী কহিলেন, "ওষুধ যদি মানুষের পরমায়ু দিতে পার্তো তাহলে ফুল আমাদের ছেড়ে চ'লে যেতো না মা।"

সোনা জবাব দিল না, নিঃশব্দে ঔষধ তৈয়ার করিয়া ফুল-মাকে খাওয়াইল। সেদিন হইতে সোনা ফুল-মার সেবায় নিজেকে উজাড় করিয়া দিল। নিজের বাড়ীতে কখনো যায় না—সারাক্ষণ ফুল-মার পাশে বসিয়া সেবা করে। তাড়া দিয়া সোনাকে নাওয়াইতে হয়, খাওয়াইতে হয়। তাহাতেও কিছু ফল হইল না।…তিন মাস ভুগিয়া জমিদার-গৃহিণী একদিন মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা মারিয়া চলিয়া গেলেন।

সোনা আবার আকুল হইয়া মাটীতে লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিল। হরগোপালবাবুর বুকে আঘাত বড় অল্প লাগিল না। রবীন্দ্র যেন পাগল হইয়া যাইবে!

শৈশব-সখী হেমাঙ্গিনী-মনোরমা সান্ত্বনা দিতে আসিলে

সোনা কহিল, "আমিই দু'জনের শনি হ'য়ে জন্মেছিলুম—আমিই দু'জনকে খেলুম।"

সখীরা বলিল "কেঁদে কি করবি বল সোনা? সংসারে তুই একলা। এমন করে দিনরাত কাঁদলে···তারপর।"

"হ্যাঁ, আমার অনেক কাজ—ঠিক বলেছিস্। কাঁদলে চল্‌বে না।" চোখ মুছিয়া সোনা উঠিয়া বসিল।

সুধীন্দ্র কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছিল;—মায়ের বাড়াবাড়ি অসুখের খবর পাইয়া যখন বাড়ী আসিল···তখন সব শেষ হইয়া গিয়াছে!

একটা মাস সুধীন্দ্র বাড়ীতে একা-একা কাটাইল, সোনাও এমন করিয়া নিজেকে সামলাইয়া চলিল যে, পরস্পরে দেখা-সাক্ষাৎ হইল না। তারপর শ্রাদ্ধ-শান্তি চুকিলে সে কলিকাতায় গেল। সোনা তখন নিজের ঘরে ঢুকিয়া দোরে খিল আঁটিয়া বিছানায় উপুড় হইয়া পড়িয়া বড় কান্না কাঁদিল। কাঁদিয়া যখন বাহিরে আসিল, তখন মুখখানা এমন যে, তাহাকে দেখিয়া গিরিশচন্দ্র চম্‌কাইয়া উঠিলেন—কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না। সোনা শশব্যস্তে রান্নাঘরে গিয়া ঢুকিল।

বৃদ্ধ বয়সে পত্নী-বিয়োগের মত দুঃখ আর নাই। সে আঘাতে হরগোপালবাবু শুধু জর্জ্জরিত হইলেন না—সংসারে নানা বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া তাঁহার অশান্তির সীমা রহিল না। মাস কয়েক পরে তিনি একদিন গিরিশচন্দ্রকে ডাকিয়া তাঁহার হাতে একখানা চিঠি দিয়া কহিলেন, "রামদাসের আক্কেল দেখ।" বলিয়া মুখখানা ভাঁরী করিয়া রহিলেন।

গিরিশচন্দ্র চম্‌কাইয়া উঠিলেন—কহিলেন, "অসম্ভব, এ কখনো হ'তে পারে! কাল-অশৌচ যেতে এখনো ছ'মাস বাকী—এ সময়ে সুধীর বিয়ে হবে কি ক'রে?"

"তাই তো! সে কথা বলে কে? আমার বিশ্বাস, আসল কথা তা নয়, আর কোথাও বোধ করি শস্তায় পাত্র পেয়েছে। তাই এই অছিলা ধ'রে এখানে বিয়ে না দিয়ে সেইখানে দেবার চেষ্টা!"

"তাই বা হবে কেমন করে—পাত্র আশীর্ব্বাদের পর?"

"আরে রেখে দাও তোমার পাত্র-আশীর্ব্বাদ"—বলিয়া হরগোপালবাবু উত্তেজিত কণ্ঠে কহিলেন—"গায়ে হলুদের পরও বিয়ে ভেঙ্গে যায়, ছাঁদ্‌নাতলা থেকে বর ফিরে যায়, অন্য বরের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে হয়। এ তো শুধু এক পক্ষে আশীর্ব্বাদ হয়েছে মাত্র।"

"তা ঠিক। ওই এক বিষয়ে আমাদের ভুল হয়ে গেছে। পাত্রী-আশীর্ব্বাদটা চুকিয়ে রাখা উচিত ছিল।" বলিয়া গিরিশচন্দ্র মুখ নীচু করিলেন।

হরগোপাল বলিলেন, "তাতেই বা হতো কি? তোমার বিয়ের গোলমাল মেটাতেই তো দু'মাস গেল—তারপর গিন্নি পড়লেন ব্যায়রামে। কাজেই আমরা না হয় সময় অভাবে পাত্রী আশীর্ব্বাদ করে আসতে পারিনি। কিন্তু কথাটা তো আর কারো জান্‌তে বাকী নেই, যেখানে যত আত্মীয়-স্বজন আছে, সকলে শুনেছে। রামদাসের যদি ইচ্ছা থাকতো তা হলে এমন অবস্থায় একথা তুলতে পারতো যে, এই মাসেই বিয়ে না

দিলে কুণ্ঠিতা হবে না! যা হোক, একবার কালই তুমি কলকাতায় গিয়ে মুখোমুখি আসল ব্যাপার জেনে এসো। সুধীন্দ্রর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কি রকম কৌশল ক'রে এ ব্যাপার হচ্ছিল, তা তার জানতে বাকী নেই! তার উপর সোনার বিয়ের পর থেকে তার ভাবগাতক যা দেখা যাচ্ছে, তাতে এ বিয়ে না হ'লে তাকে বাগানো দায় হ'বে! এ সব কথা রামদাসকে পরিষ্কার ক'রে বুঝিয়ে বোলো। আর ছ'টা মাস অপেক্ষা করতে রাজী হয় কি না দেখো। চিঠির চেয়ে সব কথা মুখোমুখি হওয়াই ভালো। চক্ষুলজ্জাও তো আছে মানুষের?"

গিরিশচন্দ্র কথান্তর না করিয়া কাজের অছিলায় কলিকাতায় গেলেন। হরগোপালবাবু উৎকণ্ঠিতভাবে তাঁহার প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষায় রহিলেন। গৃহিণীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সংসারে যে বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে তাহাতে বয়স্কা একটি পুত্রবধূ আবশ্যক হইলেও—তাহাতে যত না হোক—নগদ ঐ দশটি হাজারের প্রলোভনে বৃদ্ধ এমন বাঁধা পড়িয়াছে যে, সে লোভও সম্বরণ করিবার শক্তি নাই। তার উপর লোকাপবাদ এবং সুধীন্দ্রর ভবিষ্যৎ!

সোনা আসিয়া বৃদ্ধের দেখাশুনা ও পরিচর্য্যা করে।

বৈকালে সরবৎ আনিয়া তাঁহার হাতে দিয়া অনুযোগ করিয়া বলিল, "বেশ তো জ্যেঠা-মশাই, আমি সেই কখন থেকে

আপনার সরবৎ আর জলখাবার তৈরী করে বসে আছি—আপনি বাড়ীর মধ্যে আসবার কথা ভুলে গেছেন! আপনি যদি শরীরের এমন অযত্ন করেন, তা'হলে আমরা কার কাছে দাঁড়াবো?"

সহসা একটা আঘাতের বেদনা হরগোপালের বুকখানাকে আলোড়িত করিয়া তুলিল।—অজ্ঞাতে চোখের কোলে দু ফোঁটা জল আসিল। মনে হইল, জীবনে কি সাংঘাতিক ভুলই তিনি করিয়া ফেলিয়াছেন! এই স্নেহশীলা আদরের মেয়েটি পুত্রবধূ হইলে আজ বুঝি বা সংসারের সব সাধ বজায় থাকিত! কি বলিতে যাইতেছিলেন—বলিতে পারিলেন না।

সোনা কহিল, "ও হরি! ঘুম থেকে উঠে এখনো হাত-মুখ ধোননি!" বলিয়া তাড়াতাড়ি সে বাহির হইয়া গেল এবং মুহূর্ত্তে জল আর গামছা আনিয়া সম্মুখে রাখিয়া বলিল, "নিন, উঠুন, মুখ-হাত ধুয়ে সরবৎটুকু খেয়ে বাড়ীর ভিতরে আসুন! আমি খাবার সাজিয়ে রেখেছি। উঠুন, দেরী করবেন না—পাঁচটা বাজতে চললো।" এ কথা বলিয়া সোনা ভিতর-বাড়ীতে চলিয়া গেল।

হরগোপাল যন্ত্রচালিতের মত উঠিয়া তাহার আবদার রক্ষা করিলেন। তার পর আবার যখন বাহিরে আসিয়া তামাক লইয়া বসিলেন, তখন আবার দশহাজারের চিন্তাটা প্রবল হইয়া উঠিল। ঈষৎ হাসিয়া মনে মনে ভাবিলেন, মেয়েমানুষ জাতটাই আলাদা! ওদের মনের তত্ত্ব কিছুতেই পাওয়া যায় না। সুধীর উপর এত টান,

এমন ভালোবাসা,—সে সব ভুলে সংসার নিয়ে কেমন মেতে রয়েছে! আর সুধী ওর জন্য উদাসীর মত হয়ে আছে রামদাস যদি গোলমাল না করে, অশৌচটা যাবার পর আর একটি দিন দেরী নয়।

কিন্তু তাঁহার সে সাধ পূর্ণ হইল না। সপ্তাহখানেক যাইতে না যাইতে গিরিশচন্দ্র কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসিয়া যে খবর দিলেন—তাহাতে ক্রোধে, ক্ষোভে, লজ্জায়, অপমানে হরগোপাল অগ্নিমূর্ত্তি ধারণ করিলেন; কহিলেন, "বলো কি গিরিশ! একটু মানুষের চামড়া গায়ে নেই! স্বচ্ছন্দে বললে, বিয়ে দেবে না! তোমাকে ফিরিয়ে দিলে! আচ্ছা, আমার নাম হরগোপাল—এর শোধ যদি না নিই—"

বাধা দিয়া গিরিশচন্দ্র কহিলেন—"মানুষ হলে কি আর এমন করতে পারতো? পাঁচ হাজার টাকায় পাত্র পেয়ে ভাব্‌ছে—পাঁচ হাজার বাঁচালুম! কিন্তু এটা বুঝ্‌ল না, আমাদের ছেলে—আমাদের এতে লজ্জার কি আছে! তাঁর মেয়ে—কথা পাকা হয়ে গেছে—ওর পক্ষেই লজ্জার কথা।"

—"লজ্জা! টাকার মায়াটাই ওর বড়? কিন্তু আমরা লজ্জায় মুখ দেখাবো কেমন করে? সবাই এখন এই কথা নিয়েই কানাঘুষো করবে, কত হাসাহাসি করবে।"

—"যাক্! ওর চেয়ে বড় ঘর থেকে বৌ আনবো—ও দেখবে তখন!"

—"ঠিক কথা বলেছো গিরিশ! আমিও তাই ভাবছিলুম। এখন উপায় আছে ওর, ঝামাপুকুরেই রামদাসের এক জ্ঞাতি

ভাই আছে, তার মেয়ের সঙ্গে সুধীর বিয়ে দেবার জন্য সে সাধছিল, তাদের সঙ্গে রামদাসের ভয়ানক রেষারেষি। তখন তারা সাত হাজারের উপর উঠতে চায়নি বলে, আমি রামদাসের সঙ্গে কথা পাকা করেছিলুম। সেই মেয়েটির সন্ধান নাও তুমি।"

—"এ যদি হয়, কথাই নেই!" বলিয়া গিরিশচন্দ্র কি চিন্তা করিয়া কহিলেন, "কিন্তু এখন তারা অত দিতে পারবে ভাবেন?"

—"না দিক—যা দেয়, তাই ভালো। কিছু চাইবার দরকার নেই! রামদাস যদি পাঁচ হাজার দিয়ে পাত্র পেয়ে থাকে, তারা ওর উপর টেক্কা না দিয়ে ছাড়বে না—সাত হাজার, সাত হাজারই সই।"

গিরিশচন্দ্র কহিলেন, "আজ্ঞে, আমার তো বরং উল্‌টো মনে হয়। তারা এখন বাহাদুরি দেখাবার জন্য বরং ওদের চেয়ে কমে কাজ সারবার চেষ্টা ক'রবে। তার উপর সুধীর ভাবগতিক—"

কথাটা শেষ পর্য্যন্ত না শুনিয়াই হরগোপাল অধীরভাবে বলিয়া উঠিলেন, "আরে, তার কথা রেখে দাও। সে আমি বুঝবো! তুমি তো আগে এদিকে দেখ, কতদূর কি হয়—পরের কথা পরে।"

গিরিশচন্দ্র কি একটা কথা বলি বলি করিয়া বলিতে সাহস পাইলেন না—"যে আজ্ঞে" বলিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন।

ছয় মাসের মধ্যে এপক্ষের সঙ্গে কথাবার্ত্তা ধার্য্য করিয়া

যখন কর্ত্তাকে গিয়া চুপিচুপি কি বলিলেন, তখন হরগোপাল যেন আকাশ হইতে পড়িলেন! তিনি বলিলেন, "তা ছ'মাস আগে যখন এ কথা শুনে এসেছিলে, তখন বলোনি কেন? এই যে লেখাপড়া ছেড়ে পরমহংসের দলে মেশা—এ তো ভালো কথা নয়। অনেক ভালো ভালো ঘরের শিক্ষিত ছেলে ও-দলে মিশে সংসার-ধর্ম্ম ছেড়ে চলে গেছে!"

গিরিশচন্দ্র ইতস্ততঃ করিয়া কহিলেন, "আজ্ঞে, তখন—"

"যাক্, সে কথার আলোচনায় ফল নেই! এখন গিন্নীর এই বাৎসরিক কাজের জন্য সুধী আস্‌ছে, তুমি তাকে লিখে দাও এই হপ্তার···শনিবারেই তারা এখানে এসে আশীর্ব্বাদ সেরে যায় যেন! বৃহস্পতিবারে কাজ। শনিবারেই সুধী আর কল্‌কাতায় যেতে পারবে না। তারপর সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে আমরাও মেয়ে-আশীর্ব্বাদ সেরে এই মাসেই শুভকাজ শেষ ক'রে নেবো। কিন্তু সাবধান—এর এতটুকু যেন এখন প্রকাশ না পায়!"

কিন্তু যেখানে বাঘের ভয়, সন্ধ্যাও যেন সেইখানে আগে নামিয়া আসে। এপক্ষ হইতে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা হইলেও, কন্যাপক্ষের দিক্ হইতে কথাটা আভাসে সুধীন্দ্রর বন্ধুমহলে প্রকাশ পাইয়া তাহার কানে পৌঁছিতে যখন বিলম্ব ঘটিল না, তখন বিরাট ঘৃণায় ও লজ্জায় তাহার মুখখানা এমন কালো হইয়া উঠিল যে, সে দিন তাহার অন্তরঙ্গ বন্ধু দেবেন্দ্রর কাছেও সে মুখ দেখাইতে পারিল না। রাত্রের গাড়ীতে রওনা হইয়া পরদিন যখন গৃহে পৌঁছিল, তখন ছোট ভাই রবীন্দ্র

মাতার বাৎসরিক কার্য্য করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। সুধীন্দ্র তাড়াতাড়ি আসিয়া কাজে বসিয়া গেল।

হরগোপাল খুশী হইলেন। আসিতে বিলম্ব হইল কেন, কারণ পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা করিলেন না। কিন্তু একদিন পরেই কলিকাতা হইতে কন্যাপক্ষ যখন পাত্রকে আশীর্ব্বাদ করিবার জন্য আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন হঠাৎ চারিদিকে গোলমাল পড়িয়া গেল। বাড়ীশুদ্ধ লোক সুধীন্দ্রকে খুঁজিয়া খুঁজিয়া হয়রাণ, কোথাও তাহার দেখা মিলিল না। তাহার বালিশের নীচে হইতে চিঠি পাওয়া গেল। চিঠি পড়িয়া বৃদ্ধ হরগোপাল ভদ্রলোকদের কাছে মুখ দেখাইতে কুণ্ঠিত হইলেন। ক্ষোভে রোষে অপমানে তাঁহার সর্ব্বশরীর বহিয়া যেন আগুন জ্বলিতেছে!

গিরিশচন্দ্রকে ডাকিয়া তিনি কহিলেন, "শুনে রাখো গিরিশ —আজ থেকে সুধী আমার তাজ্যপুত্র! তার নাম পর্য্যন্ত যেন বাড়ীতে কেউ না মুখে আনে! এই চিঠিখানা নিয়ে ভদ্রলোকদের দেখিয়ে আমার হয়ে ক্ষমা চাও বাবা, আমি আর এ মুখ দেখাতে পারবো না।" বলিয়াই তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন। তারপর নিজের ঘরে গিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন।



সপ্তম পরিচ্ছেদ

* * * * *

চার বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। বৃদ্ধ হরগোপাল অন্তিম শয্যায় ক্ষীণ কণ্ঠে ডাকিলেন, "মা—"

সোনা তাঁহার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া গভীর স্নেহের স্বরে কহিল, "এই যে আমি জ্যেঠামশাই। ওষুধ এনেছি।"

বৃদ্ধ কহিলেন, "দূর করে ফেলে দাও মা, আর আমি ও ছাইভস্ম গিলবো না! এইখানে আমার কাছে তুমি একটু বসো—আমি তোমাকে দেখি।"

ঔষধে বৃদ্ধকে মহাযাত্রার পথ হইতে ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা বৃথা, এ-কথা শুধু চিকিৎসকেরাই বলিয়া গিয়াছেন এমন নয়, মনে মনে সকলেই তাহা বুঝিয়াছে।

মুখের পানে খানিক চাহিয়া থাকিয়া বৃদ্ধ সোনার একখানি হাত ধরিয়া কম্পিতকণ্ঠে কহিলেন, "মা, আর জন্মে তুই আমার মা ছিলি, না হলে আজ যখন আপন-জনরা একে একে ঠেলে চলে গেল, তখন তুই আর কেন এ মড়া আগ্‌লে বসে থাকিস?"

কাহার উদ্দেশে হরগোপাল এ কথা বলিলেন, সোনা বুঝিল। অশ্রুর প্রবল ধারা বুক ঠেলিয়া বাহির হইতে চাহিল। অসীম ধৈর্য্যে সে-অশ্রু সম্বরণ করিয়া স্নেহ-গদগদ স্বরে সোনা কহিল, "ওসব কি কথা বলছেন জ্যেঠামশাই! আমি কি আপনার পর?"

সোনার কথা শেষ হইল না, বৃদ্ধ বলিয়া উঠিলেন, "বড় ভুল করেছি মা, আসল-নকল চিনতে পারিনি। আজ যাবার সময় স্পষ্ট সব দেখতে পাচ্ছি মা! আমাকে তুমি মাপ করো!"

সোনা আর সামলাইতে পারিল না, চোখের দুফোঁটা জল পড়িল। জল মুছিয়া বৃদ্ধের পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া অপরাধিনীর মত সে কহিল, "জ্যেঠামশাই, আমি আপনার কাছে কত অপরাধ করেছি! সে সব ভুলে গিয়ে আমায় আশীর্ব্বাদ করুন।"

নিশ্বাস ফেলিয়া ক্ষীণকণ্ঠে হরগোপাল কহিলেন, "সুখী হও মা! ভগবান তোমাকে সুখী করবেন। এ সময়ে একবার যদি সে আসতো, শেষ সময়ে একটিবার দেখা—" বলিতে বলিতে আকুল নিশ্বাসে ক্ষীণ কণ্ঠ বাতাসে মিলাইয়া গেল। দু ফোঁটা অশ্রু কোটরগত দুই চোখের কোণে সঞ্চিত হইয়া পদ্মপত্রে জলবিন্দুর মত টল্‌টল্‌ করিতে লাগিল!

সোনা আঁচলে সে জল মুছাইয়া দিয়া আশ্বাসভরা কণ্ঠে বলিল, "তিনি জানেন না জ্যেঠামশাই!—জানলে নিশ্চয় ছুটে আসতেন।"

—"জানে, জানে—" বলিয়া রবীন্দ্র ঘরে ঢুকিয়া কহিল, "এই যে এতগুলো চিঠি লেখা হলো—দাদা কি তার একখানাও পায়নি? ইচ্ছা থাকলে—"

সোনার মন বলিতেছিল সুধীন্দ্র খবর পায় নাই। সে বলিল, "কখ্‌খনো খবর পাননি রবি, হয় চিঠি মারা গেছে,

—নাহয় তাঁকে দেওয়া হয়নি—এ আমি জোর করে বলতে পারি।"

প্রতিবাদ শুনিয়া রবীন্দ্র কহিল, "না, দেওয়া হয়নি! তুমি অমনি বললেই হলো।"

সোনা একটু ক্ষুণ্ণ হইয়া স্তব্ধ রহিল। বৃদ্ধ হরগোপাল পর্য্যন্ত বিরক্ত হইলেন। তিনি কহিলেন, "ওরে—আর শত্রুতা সাধিসনে! শান্তিতে আমায় চোখ বুজ্‌তে দে!"

রবীন্দ্রর ঠোঁটের ডগায় কি একটা কথা আসিয়াছিল, তাহা চাপিয়া একবার বৃদ্ধের দিকে চাহিয়া, পরক্ষণে সোনার মুখের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল। তারপর কি ভাবিয়া একটু ইতস্ততঃ করিয়া সে কহিল, "ওঁকে চুপ ক'রে একটু ঘুমোতে দাও সোনাদি, এ সময় পাঁচ কথা কইলে খারাপ হতে পারে। ডাক্তার বিশেষ করে বলে গেছেন, এ ঘরে যেন লোকের ভিড় করা না হয়।" বলিয়াই জবাবের অপেক্ষা না করিয়া দ্রুতপদে সে বাহির হইয়া গেল।

সোনার মুখ রাঙা হইয়া উঠিল! কি কথা বলি-বলি করিয়াও বলিতে ভরসা পাইল না। বিছানা ঝাড়িয়া, বালিশ গুছাইয়া দিয়া সে বাহির হইয়া যাইতেছিল, বাধা দিয়া বৃদ্ধ কহিলেন, "হাতী পাঁকে পড়লে ব্যাঙেও লাথি মারে, মা' কিন্তু উপায় নেই!—হাতছাড়া হয়ে গেছে।"

সোনা ফিরিয়া বিস্ফারিত চোখে বৃদ্ধের মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

বৃদ্ধ কহিলেন, "এখনো যদি গিরিশ ফিরে আসে!"

"তিনি ইচ্ছা করে দেরী করতে পারেন না জ্যেঠামশাই! নিশ্চয় তাঁকে সঙ্গে নিয়ে আসছেন।"

"তোর মুখে ফুলচন্দন পড়ুক মা! একবার তাকে চোখে দেখতে পেতুম যদি!"

সোনার কথা মিথ্যা হইল না। সেদিন বৈকালে সুধীন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া গিরিশচন্দ্র কলিকাতা হইতে ফিরিলেন। রোগীকে একটু সুস্থ দেখিয়া সোনা কাজের অছিলায় বাড়ী চলিয়া গেল।

সন্ধ্যায় তুলসীতলায় আলো দেখাইয়া সোনা প্রণাম করিতেছে, গিরিশচন্দ্র বাড়ী আসিলেন, আসিয়া বলিলেন, "শীগ্গির একবার এদিকে এসো।"

তুলসীতলায় গড় করিয়া সোনা প্রদীপ হাতে কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

"এ বেলা গতিক ভালো নয়! রাতটা কাটে কি না!"

গিরিশচন্দ্র কথা শেষ করিতে না করিতেই সোনা বলিল, "তা'হলে আমি যাবো তোমার সঙ্গে!"

গিরিশচন্দ্র কহিলেন—"গিয়ে আর কি দেখ্বে সোনা? জ্ঞান নেই।"

সোনার চোখ অশ্রুতে টল্টল্ করিয়া উঠিল। নিশ্বাস ফেলিয়া সে কহিল—"তা হোক—তবু—যাবো!"

ঘর-দ্বার বন্ধ করিতে করিতে কুণ্ঠিত স্বরে সোনা জিজ্ঞাসা করিল—"তখনও জ্ঞান ছিল না, যখন—"

গিরিশচন্দ্র বুঝিলেন—সোনা সুধীন্দ্রর আসার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছে। তিনি বলিলেন—"হ্যাঁ, সুধীর সঙ্গে দু' একটা

কথা হলো। কিন্তু তাতে কিছু হলো না সোনা! ওঁর যদি আর জ্ঞান না ফেরে—এত বড় জমিদারীর এক টুকরো পাবে না। বাবু তাকে বিষয় থেকে বঞ্চিত করে উইল করেছেন।”

ঘর-দ্বার বন্ধ করিয়া সোনা স্বামীর সহিত যখন জমিদার-গৃহে উপস্থিত হইল, তখন হরগোপালবাবুর অন্তিম ঘনাইয়া আসিয়াছে। সোনা দেখিল—পিতার পালঙ্কের নীচে সুধীন্দ্র দু-হাঁটুর ফাঁকে মুখ গুঁজিয়া বালকের মত কাঁদিতেছে।

মুহূর্ত্তের জন্য হরগোপালের জ্ঞান ফিরিল, অবোধ শিশুর মত তিনি ডাকিলেন—“মা—মা—”

সোনা কাছে আসিল। সোনার ডান হাতখানি তিনি চাপিয়া ধরিলেন, তারপর সুধীন্দ্রর উপর মিনতিপূর্ণ চোখে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া চেতনা হারাইলেন। সোনা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। গিরিশচন্দ্র ছুটিয়া আসিলেন,—তখন সব শেষ।

* * * তিন চার দিন পরে স্বামীকে সোনা প্রশ্ন করিল—“কবে রাগের মাথায় জ্যেঠামশাই উইল করে সুধীদাকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করেছিলেন বলে এখনো তাই বজায় থাকবে?”

—“হ্যাঁ।” বলিয়া গিরিশচন্দ্র নিশ্বাস ফেলিলেন। কিন্তু কথাটা সোনার ভালো লাগিল না, খুব জোর গলায় সে বলিল, “এ অন্যায়! জ্যেঠামশাইয়ের মনে ইদানীং আর একটুও রাগ ছিল না। ওঁকে দেখবার জন্য ছট্‌ফট করছিলেন। সেদিন সকালে পর্য্যন্ত আমার কাছে—”

“তা আমি জানি!” গিরিশচন্দ্র কহিলেন, “তাই ব’লছিলুম, সুধী যদি একটা দিনও আগে আসতো, তা’হলেও উপায় হতো,

কিন্তু এ-ও এক-রকম ব্যবস্থা মন্দ হয়নি। সুধী পড়াটড়া ছেড়ে দেশের কাজে যে রকম মেতে উঠেছে, তাতে এই বিষয়-সম্পত্তি হাতে প'ড়লে কি আর রক্ষা ছিল! দুদিনে ভূতের শ্রাদ্ধে সব উড়িয়ে দিত। এ তবু ছোটর রইলো। বিষয় আমার মুঠোর মধ্যে থাকবে—নষ্ট হবে না।"

সোনা সবিস্ময়ে স্বামীর উপর বিস্ফারিত চোখের স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ও! তা'হলে এতে তোমারও হাত ছিল!"

ঈষৎ হাসিয়া গিরিশচন্দ্র জবাব দিলেন, "হঁ্যা, তোমার কাছে মিথ্যা বলবো না। কর্ত্তা তখন রাগের মাথায় সুধীকে সর্ব্বস্ব থেকে বঞ্চিত করতে চেয়েছিলেন। আমি ততটা করতে দিইনি। সম্পত্তির ঝক্কি ওর পোষাবে না। একলা মানুষ—বিয়ে-থা করলে না—করবেও না—বিষয়-আশয়ের দরকার কি! এ বেশ নির্ঝঞ্ঝাটে মাসে দেড়শো টাকা করে পাবে, তাতে সুখে স্বচ্ছন্দে চলে যাবে।"

সোনার মুখ-চোখ রাগে রাঙা হইয়া উঠিল। তিক্তস্বরে কি বলিতে গিয়া নিজেকে সাম্লাইয়া লইয়া সে বলিল—"যার জিনিষ তাকে না দিয়ে, নিজের হাতে রাখবার জন্য তোমার এত মাথা-ব্যথা কেন, শুনি?"

"ভুল বুঝো না সোনা।" গিরিশচন্দ্র কহিলেন, "অন্য লোক যাই বলুক, আমাকে ছেলেবেলা থেকে তুমি জানো। এর সঙ্গে আমার বুকের এক-এক বিন্দু রক্ত মিশে আছে! আমার একটা অঙ্গ আমি অনায়াসে কেটে ফেলে দিতে পারি, তবু এ সম্পত্তি বরবাদে যাবে—এর সঙ্গে আমার সংস্রব ঘুচে যাবে, প্রাণ

থাকতে তা আমি সহ্য করতে পারবো না। আমাকে তিনি যখ বসিয়ে গেছেন।" কথাটা বলিয়া গিরিশচন্দ্র জমিদার-বাড়ীর দিকে চলিয়া গেলেন। সোনা বিমূঢ়ের মত বসিয়া রহিল।

স্বামীর স্বভাব সে জানিত না, এমন নয়। পরের সম্পত্তি ফাঁকি দিয়া নিজে গ্রাস করিবে, এমন হীন প্রকৃতি গিরিশচন্দ্রের নয়। লোকে জমিদারের গোমস্তাগিরি করিয়াও বাড়ীতে দোল-দুর্গোৎসব করে, কোঠা-বালাখানা করিয়া যায়। কিন্তু এত বড় জমিদারীর ম্যানেজারী করিয়াও নিজের সংসারের দিকে লক্ষ্য নাই। তবু কেন তিনি একজনের ন্যায্য অধিকারে হস্তারক হইয়া নিজের আধিপত্য বজায় রাখিবার জন্য সচেষ্ট হইয়া উঠিলেন, এ এক গভীর রহস্য!



অষ্টম পরিচ্ছেদ

হরগোপালের শ্রাদ্ধের কথা লইয়া আলোচনার বিরাম নাই। পুরোহিত মথুর চক্রবর্ত্তী আসিয়া বলিলেন, "দান-সাগর হওয়াই উচিত! সাতখানা গাঁয়ে শুনে এলুম, সকলে তাই চায়।"

ঠোঁটের কোণে ঈষৎ হাসি···গিরিশচন্দ্র কহিলেন, "উচিত বটে চক্কোত্তি মশাই, কিন্তু সে কি সাধারণ ব্যাপার? খুব টেনে টুনে ধরতে গেলেও দশ হাজারের কমে হবে না।"

"হোক! তিনি কম রেখে যাননি! তার উপর এমন যোগ্য দুই ছেলে বর্ত্তমান!" বলিয়া চক্রবর্ত্তী আরো কি বলিতে যাইতেছিলেন, বাধা দিয়া গিরিশচন্দ্র কহিলেন, "স্বীকার করি, কিন্তু এটাও দেখতে হবে, ওই দশ-হাজার সঞ্চয় করতে মাথার কত ঘাম তাঁর পায়ে পড়েছে! খুব ভালো করে বৃষোৎসর্গ, দু'টো ষোড়শ—"

"আরে, সে তো একটা হেঁজিপেঁজি তালুকদারের শ্রাদ্ধেও হয়ে থাকে! কি বলো, ভায়া?" বলিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয় সুধীন্দ্রর দিকে চাহিতেই সে গিরিশচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিল, "কি বলো গিরিশদা! টাকার কথা ছেড়ে দিন—দান-সাগরে কি হাঙ্গাম খুব বেশী? আমরা তিন ভাইয়ে সামলাতে পারবো না?"

"কর্ত্তার কাজে ঝঞ্ঝাট-হাঙ্গাম যাই হোক, সে ভয় করি না! তবে কি না"—বলিয়া একটু ইতস্ততঃ করিয়া গিরিশচন্দ্র পুনরায় কহিলেন, "তা তোমার মনে যদি সে ইচ্ছা হয়ে থাকে, বেশ— চক্কোত্তি মশায়কে নিয়ে একটা ফর্দ্দ করে ফেল!" বলিয়া চিন্তিতভাবে তিনি প্রস্থান করিলেন।

চক্রবর্ত্তী মশায় বলিয়া উঠিলেন, "যার জিনিষ, সে খরচ করতে চাইছে, ওঁর বুক চড়-চড়িয়ে উঠলো! আমি কিছু বুঝি না, বটে?" বলিয়া এমন ইঙ্গিত করিলেন যে, সুধীন্দ্রর মন পুরোহিতের উপর তিক্ত হইয়া উঠিল। বিরক্ত হইয়া সে বলিল, "কাকে কি বলছেন চক্কোত্তি মশাই! গিরিশদা না থাকলে—"

তাহাকে কথা শেষ করিতে না দিয়া চক্রবর্ত্তী মশায় খপ করিয়া বলিলেন, "তোমাকেও আজ পথের ভিখারী হতে হতো না। কার মুখে হাত চাপা দেবে ভাই? এ-কথা সারা গাঁয়ে কে না জানে? রবি তো সেদিনকার ছেলে, বিষয়-সম্পত্তির ও বোঝে কি—জানেই বা কি? নামে ওকে খাড়া রেখে তোমাকে সরিয়ে নিজের পেট ভরাবার মতলবটি পাকা করে নিয়েছে বটে! তা গাঁ-শুদ্ধ লোক তোমার দিকে ভাই—তুমি কিছু ভেবো না। জোর করে নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াও, তোমার ন্যায্য পাওনা-গণ্ডা কেমন তুমি না পাও—আমরা বুঝে নেবো। মামলা দেখে দেখে আমাদের মাথার চুল পেকে গেছে! উনি জমিদারীর ম্যানেজারী করেন বলে পীর নাকি? গাঁ-শুদ্ধ লোকের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারবেন? ও উইল জাল বলে

প্রমাণ করতে না পারি তো আমার নাম মথুর চক্কোত্তি নয়। তুমি গ্যাঁট হয়ে বসে থাকো ভায়া!—খবর্দ্দার ওর সলায় ভিজো না! হ্যাঁ—দান-সাগর করা চাই-ই!" বলিয়া চূড়ান্ত আত্মীয়তা জাহির করিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন।

পিতৃ-বিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে আরো নানা কারণে মনে কষ্ট—উইলের কথা এতক্ষণ সুধীন্দ্রর মনে ছিল না, এখন মনে পড়িল; পড়িতে সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। দান-সাগর শ্রাদ্ধের কথা বলিয়া কত বড় অন্যায় করিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিয়া লজ্জায় সে মাথা তুলিতে পারিল না।

গিরিশচন্দ্র ফিরিয়া আসিলেন—আসিয়া কহিলেন, "দান-সাগর করাই ঠিক করে ফেললুম ভায়া! রবি তোমার মতের বিরুদ্ধে কাজ করতে পারে না—করা উচিতও নয়।"

কথাটা প্রকাণ্ড উপহাসের মত সুধীন্দ্রর কানে বাজিল। মুখখানা অন্য দিকে ফিরাইয়া সে কহিল, "বেশ, তাই তার উচিত—শুনে খুশী হলুম।"

"কিন্তু আমি এদিকে মাথা তোলবার সময় পাবো না সুধী—তোমাকেই কষ্ট করে কলকাতায় গিয়ে দেখে শুনে সব কিনে আনতে হবে।"

বিরক্ত হইয়া সুধীন্দ্র বলিল—"সে ঝক্কি আর আমার ঘাড়ে কেন! যার কাজ, সে তো আর ছেলে মানুষটি নয়।"

গিরিশচন্দ্র মর্ম্ম বুঝিতে পারিলেন না, সবিস্ময়ে তাহার পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "যার কাজ, তার মানে? তোমার ইচ্ছাতেই তো দান-সাগর হচ্ছে! না হলে—"

"গরীবের ইচ্ছায় অনিচ্ছায় কি এসে যায় দাদা ?" বলিয়া সুধীন্দ্র হঠাৎ গম্ভীর হইয়া গেল ; তারপর বলিল, "রবির যা সুবিধা, সে তাই করবে—আমার কিছু বলবার নেই। আমার যা সাধ্য, আমি তিল-কাঞ্চন করে যাতে শুদ্ধ হ'তে পারি, তাই করবো।"

গিরিশচন্দ্রের মনে বড় আঘাত লাগিল। দুঃখিতভাবে তিনি বলিলেন, "সে কি হতে পারে ভায়া ? কর্ত্তার মান-সম্ভ্রমের যোগ্য কাজ তোমাদের করতেই হবে।"

"করতে হবে. কিন্তু সে-ভাবনা আমার আর নেই। বিষয়-সম্পত্তি যে রক্ষা করবে, সে-ব্যবস্থা তার উপর নির্ভর করছে। আমার সামর্থ্যে যা কুলোয়, তাতে তিল-কাঞ্চনের উপর ওঠবার উপায় নেই।"

গিরিশচন্দ্র লক্ষ্য করিলেন, ঈষৎ হাসিয়া তিনি বলিলেন, "ভুল করো না ভায়া, কর্ত্তার শ্রাদ্ধের খরচ তাঁর এষ্টেট থেকেই হবে। এতে কারো নিজের—"

সুধীন্দ্র একটু বিরক্ত ভাবেই কহিল, "জমিদারীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি ? আমি শুধু তোমাদের এষ্টেট থেকে ভিখারীর মত ভাত-কাপড়টা পাবো। এ-সব বিষয়ে আমাকে আর কিছু জিজ্ঞাসা না করলেই ভালো হয়।"

সুধীন্দ্র চলিয়া যাইতেছিল, গিরিশচন্দ্র তাহার হাত ধরিয়া কহিলেন, "পাঁচজনের কথা কানে তুলো না সুধী,—কর্ত্তা রাগের ঝোঁকে যা-ই করে যান, তুমি বড় ছেলে—সকল দায় তোমার।"

উষ্ণ হইয়া সুধীন্দ্র কহিল, "তাই যদি, তা'হলে তাঁর অসুখের খবর আগে থাকতে আমায় না দিয়ে চুপ করে কাজ হাসিল করতেন না।"

গিরিশচন্দ্রের মুখ বিবর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি আর জবাব না দিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইলেন।

সুধীন্দ্র দু'চার পা আগাইয়া চলিয়া যাইতেছিল, হঠাৎ ফিরিয়া সহজ কণ্ঠে বলিল, "তুমি আমাকে ভুল বুঝো না দাদা,—তোমাকে আমি ছেলেবেলা থেকে চিনি। পাঁচজনের কথা শুনে তোমার উপর আমার মনে একটা খট্‌কা লাগলো, নাহ'লে,--" বলিয়া একটু থামিয়া, ক্ষুব্ধস্বরে বলিল, "বাবার অসুখের খবর আমার কাছে গোপন করে রাখবার উদ্দেশ্য কি, আজও আমি তা বুঝে উঠ্‌তে পারিনি।"

গিরিশচন্দ্র তাহার হাত দুখানা চাপিয়া ধরিয়া অপরাধীর মত কহিলেন, "সেজন্য আমায় মাপ করো ভায়া, সেটা কতক ঔদাস্যে! যাক, সে পরে জানতে পারবে। আর ঐ উইলের কথা—লোকে যাই বলুক, কর্ত্তা তখন রাগের বশে যা করেছিলেন, সেটা তাঁর উচিত হয়নি। ইদানীং তাঁর সে-রাগ আর ছিল না। তুমি বড় ছেলে—তুমি ইচ্ছা করলে এখনই ও উইল নাকচ করতে পারো—এতটুকু অমত বা আপত্তি তাতে কারো হবে না। বলো যদি তো আগে সে কাজ সেরে নিচ্ছি।"

সুধীন্দ্র আর সামলাইতে পারিল না, কম্পিত কণ্ঠে বলিল, "ছি ছি—কি বলছো গিরিশ-দা! আমি তোমাকে চিনি—

বাবাকেও চিনতুম। রাগের বশে হোক, আর যে-কারণেই হোক, তিনি ইচ্ছা করে যা করে গেছেন, তার উপর আমি হাত দেবো না—সে ইচ্ছা নেই। গরীবের কি দিন চলে না? আমার দিনও ভগবান চালিয়ে দেবেন।" বলিয়া জবাবের অপেক্ষা না করিয়া সে চলিয়া গেল।

ইহার পর দানসাগর শ্রাদ্ধ হইতে আর বাধা রহিল না। প্রায় একপক্ষ ধরিয়া সারা দেশ বিরাট সমারোহে মাতিয়া রহিল।

ক'দিন কাজের ঝঞ্চাটে সুধীন্দ্র নিজের কথা ভাবিবার সময় পায় নাই। জ্ঞাতি-ভোজনের পরদিন সকালে ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে কোথা হইতে মনে দারুণ অবসাদ জাগিয়া বর্ষার আকাশের মত তাহার মনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। সে মুক্ত বাতাসে যাইবার জন্য মাঠের পথে বাহির হইয়া পড়িল। বেলা তখন অনেক। রৌদ্রের তেজ প্রখর। সুধীন্দ্রর মাথা জ্বালা করিয়া উঠিল। গা-হাত ঝিম্‌ঝিম্‌ করিতে লাগিল। পথ হইতে নামিয়া, একটা বাগানের পাশ দিয়া গাছের ছায়ায় ছায়ায় সে চলিতে লাগিল।

এই বাগানের পাশে সোনাদের বাড়ী। সুধীন্দ্র বেশ দ্রুত পায়ে বাড়ীর সদর অতিক্রম করিতেছিল—সহসা পিছন হইতে অনুচ্চস্বরে কে ডাকিল, "সুধী-দা!"

সুধীন্দ্রর সর্ব্বাঙ্গ বাহিয়া তড়িতের প্রবাহ! দাঁড়াইয়া

পিছন ফিরিয়া সে দেখে, দরজায় দাঁড়াইয়া সোনা। সোনা বলিল—"শুনে যাও সুধী-দা।"

কতদিন—কতদিন পরে—আবার এ আহ্বান! সোনার বিবাহের পর হইতে যদি বা চকিত-বিদ্যুতের মত দু'চারিবার দুজনে দেখা হইয়াছে—সে ওই বিদ্যুতের মত নিমেষের জন্য! এতদিন পরে বাল্য সহচরীর এই কণ্ঠ কি করুণ সুরে সুধীন্দ্রর কাণে বাজিল! বিহ্বলের মত কখন সে বাড়ীর ভিতর আসিয়াছে, নিজেই বুঝিতে পারিল না।

একটা কার্পেটের আসন আনিয়া বারান্দায় পাতিয়া সোনা বলিল "বসো।"

সুধীন্দ্র বারান্দার উপর আসনে বসিতে গিয়া চমকিয়া উঠিল। বহুদিন পূর্ব্বে সুধীন্দ্রকে দিয়া কলিকাতা হইতে পশম আনাইয়া সোনা এখানা সযত্নে বুনিয়াছিল। সুধীন্দ্রর বুকখানা তোলপাড় করিয়া একটা নিশ্বাস—চৈত্রের পাগলা হাওয়ার মত জাগিয়া উঠিল, প্রাণপণ চেষ্টায় সে তাহা দমন করিয়া আসনে বসিল।

আঙ্গুলে আঁচল জড়াইতে জড়াইতে সোনা বলিল, "কদিন আর আছো?"

অন্য দিকে মুখ করিয়া সুধীন্দ্র বলিল, "ভালো লাগছে না, বোধ হয় আজই বিকেলের গাড়ীতে চলে যাবো।"

সোনা আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "সে কি! এত খাটুনি গেল —একটা দিন জিরোবে না? দেহ কি হয়ে গেছে!"

সোনা আর বলিতে পারিল না। গলা ভারী, চোখ সজল, অন্য দিকে সে মুখ ফিরাইয়া লইল।

আবেগ-উচ্ছ্বাস সুধীন্দ্রর বুকে জমাট বাঁধিয়া ঠেলিয়া উঠিতেছে! জোরে বার কয়েক কাসিয়া সে বলিল, "আমার জিরোবার জায়গা বাবা এখানে রাখেননি সোনা!"

"ভুল বুঝো না সুধী-দা! আমি তাঁর কাছে ছিলুম বরাবর! তোমাকে দেখবার জন্য কি ছটফট করেছেন!...কেবল বলতেন —সে কি আর আসবে না, মা?"

সুধীন্দ্রর দু'চোখে জল...সে জবাব দিতে পারিল না। সোনা আবার বলিল, "যদি আর একটা দিন আগে আসতে সুধী-দা!"

সুধীন্দ্র কহিল, "কেমন করে জানবো যে তাঁর এমন অসুখ! তা'হলে একটা দিন কেন, এক মাস আগে আমি ছুটে আসতুম।"

"সে কি! তুমি জানতে না? আমি তাঁকে বরাবর তাই বলেছি,—তুমি খবর পাওনি! আমার মন তাই বলতো।"

সুধীন্দ্র বলিল, "আমি তখন উত্তর বাংলায় বন্যার কাজে গেছি। কিন্তু আমার কাছে খবর দেবার ব্যবস্থা করে যেতে ভুলিনি! একটু চেষ্টা করলেই ওঁরা খবর দিতে পারতেন। এখন বুঝ্‌ছি, ইচ্ছা করেই খবর দেননি।"

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সোনা জিজ্ঞাসা করিল, "এখন বাড়ী ছেড়ে গিয়ে কি করবে?"

"কিছু ঠিক করিনি। তবে একটা কিছু করতে হবে। খেটে খাওয়া ছাড়া গরীবের অন্য আর কি উপায় আছে?"

সোনার চোখে আবার জল নামিয়া আসিল—মিনতির স্বরে বলিল, "আমার একটা কথা রাখবে?"

সুধীন্দ্র কহিল, "বলো—যদি পারি, রাখবো।"

"ইচ্ছা করলেই পারো সুধী-দা !—উনি বলেন, কর্ত্তা উইলে যাই করে যান, তুমিই বিষয়ের মালিক।"

"এ কথা সত্য নয়, সোনা।"

"আমি তা বলছি না। তবে কলকাতায় গিয়ে যা করতে চাও, এখানে থেকে তা হয় না ?"

কি ভাবিয়া সুধীন্দ্র কহিল, "পরের গোলামি করতে কখনো শিখিনি—পারবো না ! কিন্তু একটা কিছু করতে হবে। তাই ভাবছি, কোথাও কিছু জমি নিয়ে কাপাসের চাষ করে তুলোর ব্যবসা—"

উৎসাহ-ভরে সোনা বলিয়া উঠিল, "এখানে তো কাপাস চাষের চমৎকার জমি আছে, তাই নিয়ে এখানেই কেন—"

মুখে ক্ষীণ হাসি···সুধীন্দ্র বলিল, "টাকা চাই সোনা। মুলধন দরকার। আগে আমায় সে চেষ্টা করতে হবে। যদি কোনো বন্ধুর সঙ্গে বখ্‌রায় কাজ করতে পারি—"

"বখরার দরকার কি ! আমি টাকা দেবো। তোমার পায়ে পড়ি সুধী-দা,—অমত করো না।"

সোনা ঘরে ঢুকিয়া একটা হাতবাক্স বাহির করিয়া আনিল। বলিল, "আমার পাঁচ হাজার টাকার গহনা আছে—নিজের। মা নিজের থেকে তিন হাজার টাকা দিয়ে গিয়েছিলেন, আর জ্যেঠা-মশায় দিয়েছেন দু'হাজার টাকার। এই নিয়ে তুমি ব্যবসা করো সুধী-দা—আর কোথাও যেয়ো না।"

সুধীন্দ্র অবাক হইয়া সোনার দিকে চাহিল। এতক্ষণে

নজর পড়িল—দু'হাতে দু'গাছি রুলি ছাড়া সোনার অঙ্গে আর কোনো গহনা নাই। সুধীন্দ্র মাথা নীচু করিল, তার দু'চোখ জলে ঝাপ্‌সা।

মাথা নীচু করিয়া সোনা বলিল, "এত সব বোঝা নিয়ে আমি কি করবো? একদিনের জন্য গায়ে দিইনি—দরকারও হবে না কখনো পরবার।"

এতক্ষণ পরে সোনার ভিতরটা সুধীন্দ্র স্বচ্ছ দর্পণের মত দেখিতে পাইল। যে গহনার চেয়ে প্রিয় বস্তু স্ত্রীলোকের নাই, কত দুঃখে নারী তাহা ছাড়িয়া দিতে পারে···বুঝিয়া সুধীন্দ্রর অন্তরাত্মা হা হা করিয়া উঠিল। সে উঠিল, বলিল, "চললুম সোনা! মাপ করো আমাকে,—"

কথা শেষ হইল না—গিরিশচন্দ্র বাড়ী ঢুকিয়া সানন্দে বলিয়া উঠিলেন, "সে কি,—চললুম কি? না, না, তা হবে না ভায়া! আমি ভরসা করে তোমাকে বলতে পারিনি, কিন্তু দয়া করে যখন নিজে এসে পড়েছো—তখন ছেড়ে দেবো না।" বলিয়া সুধীন্দ্রর হাতখানা তিনি চাপিয়া ধরিলেন।



নবম পরিচ্ছেদ

ছ-সাত মাস পরে কলিকাতায় বিরাট খদ্দর-প্রদর্শনীর পর সারা বাংলা দেশ জুড়িয়া রীতিমত চাঞ্চল্যের স্বৃষ্টি হইয়াছে। জীবনবাবু তাঁহার দীর্ঘকালের ওকালতি ব্যবসা ছাড়িয়া মুকুন্দপুরে নিজের দেশে আসিয়া বসিলেন। গ্রামের লোক শুধু খুশী হইল না—স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল। নায়েব-গোমস্তার পেট ভরাইবার জন্য কাহারও আর প্রাণান্ত ঘটিবে না! কী তাহাদের অত্যাচার! গরীব গৃহস্থ মানুষ—নিশ্চিন্ত মনে পেট ভরিয়া দুবেলা ভাত খাইবে, সে উপায় ছিল না! সদাই ভাবনা—কখন কার ঘটি-বাটি গোরু-বাছুর টানিয়া লইয়া যাইবে।

গ্রামের ইতর-ভদ্র সকলেই বাড়ীতে জড়ো হইতে লাগিল এবং নিত্য তাহারা যে-সব নালিশ জানাইতে স্বরু করিল, শুনিয়া জীবনবাবু স্তম্ভিত! নায়েব গোমস্তাদের উপর রাগ হইল, কিন্তু প্রকাশ্যে কাহাকেও কিছু জানিতে দিলেন না।

দেশের ঘর-বাড়ী বাসোপযোগী করিয়া স্থির হইয়া বসিবার পর একদিন সন্ধ্যার সময় তাঁহার কন্যা অপর্ণা চায়ের পেয়ালায় চা ঢালিতে ঢালিতে বলিল, "পাড়াগাঁ এমন—আগে তা ভাবতে পারিনি, বাবা! বইয়ে গ্রামের কথা পড়ে মনে তার যে রকম ছবি এঁকেছিলুম এখন দেখ্ছি—আসলের সঙ্গে তা খাপ খায় না।"

"কেন রে, এখানে তোর মন টেঁক্‌ছে না ?"

"খুব মন টেঁকেছে বাবা! এমন যদি আগে জানতে পারতুম, তা হলে অনেক আগে তোমাকে পশ্চিমের সে কড়া দেশ থেকে এখানে টেনে নিয়ে আসতুম।"

অপর্ণা কহিল, "এই তো এতকাল এলাহাবাদে ছিলুম। এখানে দু'দিন এসেছি—এর মধ্যে গাঁ-শুদ্ধ লোকের সঙ্গে এমন ভাব হয়েছে, তারা আমায় এক দণ্ড ছাড়তে চায় না! যেন কত আপনার!—কী আদর-যত্ন!—তোমায় কি বলবো বাবা, সব বাড়ীর গিন্নীরা কতরকম খাবার তৈরী করে বলে—এটা খাও, ওটা খাও।—এত গরীব, তবু কারো বাড়ীতে গেলে মাথায় তুলে ধরে! পরের উপর এমন টান কোথাও দেখিনি।"

"এইটুকুই আমাদের বাংলা দেশের গ্রামের বিশেষত্ব মা! যে যত গরীব হোক, বাড়ীতে মানুষ এলে ভাবে, মা লক্ষ্মীর পায়ের ধূলো পড়্‌লো—নিজে উপোসী থেকেও তাদের যত্ন আদর করতে ছাড়ে না। তার উপর তুমি এদের জমিদারের মেয়ে···তাদের সঙ্গে মেলা-মেশা করছো!"

"কেন মেলা-মেশা করবো না? না হয় তারা গরীব—তা' ব'লে কি মানুষ নয়? এমন মন, এমন প্রাণ এলাহাবাদে বড় মানুষদের ঘরেও দেখিনি।"

মেয়েটি সাত বছর বয়সে মাতৃহারা হইয়া আজ ছ-বছর ধরিয়া পিতা পিতামহীর ক্রোড়ে এলাহাবাদে মানুষ হইতেছিল। জীবনবাবু আর বিবাহ করেন নাই। এই মেয়েকে অবলম্বন করিয়া দিন কাটাইতেছিলেন। কাজেই জীবনে ঘর-বাড়ী কি

বিষয়-সম্পত্তির উপর তেমন মায়া ছিল না। কিন্তু দু-বছর পূর্ব্বে যখন মায়ের মৃত্যু হইল এবং মেয়ে বড় হইতে চলিল, তখন পিতা-পুত্রী ভিন্ন পরস্পরের আর অবলম্বন না থাকায় জীবনবাবু দেশে ফিরিবার আবশ্যকতা বুঝিয়া তখন হইতেই সে চেষ্টা করিতেছিলেন—তারপর হঠাৎ ভারতের সর্ব্বত্র এই চরকা আর খদ্দর প্রচারের সমারোহ। তাঁহার যেন সুযোগ মিলিয়া গেল।

পিতার আদরে যত্নে মা-হারা মেয়ের শিক্ষা লাভ ভালোই হইয়াছে। তার উপর নানা পুস্তক-পত্রিকায় দেশের সেই আন্দোলনের কথা পড়িয়া সে এমন মাতিয়া উঠিল যে, বাড়ীতে বিদেশী বিলাসিতা বর্জ্জন করিয়া খদ্দর কাপড় চালাইয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিল না, সহপাঠিনীদেরও এদিকে চেতনা-সঞ্চারে মন দিল। কিন্তু তাহাদের কাছে তেমন সাড়া মিলিল না—তখন সে পিতাকে ধরিয়া বসিল—"এখানে থাকতে আর মন চাইছে না বাবা!—চলো, দেশে যাই। সেখানে আর কেউ যদি আমাদের কথা না শোনে, যারা প্রজা, তারা শুনবে। সেখানে আমাদের অনেক জমি, তাতে কার্পাস চাষ করাবো—প্রজাদের ঘরে ঘরে চরকা চালাবো। আমাদের দেখাদেখি আর পাঁচজন জমিদারও যদি তখন তাই করে, তা'হলে খুব কাজ হবে।"

জীবনবাবুও এ-কথা বুঝিলেন, কিন্তু মেয়ের মত অতখানি ভরসা তাঁহার নাই। তবু এলাহাবাদের বাস তুলিয়া দেশে ফিরিলেন। কলিকাতায় তখন 'খদ্দর-প্রদর্শনী'র বিরাট সমারোহ।

অপর্ণা জিদ্ করিয়া পাঁচ-সাত দিন কলিকাতায় থাকিয়া প্রদর্শনীতে ঘুরিয়া চরকা আর খদ্দর-সংক্রান্ত অনেক তথ্য সংগ্রহ করিল এবং কল্পনায় ভবিষ্যতের রঙীন ছবি লইয়া যখন দেশে আসিয়া বসিল, তখন সেখানকার দৈন্য দেখিয়া তাহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল।

মেয়েকে উৎসাহ দিবার জন্য জীবনবাবু বলিলেন, "এ কথা সত্য মা, গরীব গ্রামের লোকের বুকে যে প্রাণ আছে, সহরের বড় মানুষদের তেমন নেই,—দেশের কাজ করবার পক্ষে প্রশস্ত ক্ষেত্র বটে, কিন্তু এত গরীব এরা—"

বাপের কাছে অপর্ণার শরম-সঙ্কোচ কিছু নাই। সে বলিল, "গরীব যে হয় বাবা, সে আমাদেরই দোষে। শুনতে পাই আমাদের—" বলিয়াই একটু থামিয়া কথাটা ঘুরাইয়া লইয়া কহিল, "আমরা জমিদার হয়ে যদি ওদের অবস্থার দিকে না চাই, তাহলে ওরা তো নষ্ট হয়ে যাবেই।"

"ঠিক বলেছিস্ মা! এতকালের অবহেলায় যে অনিষ্ট হয়েছে,—যে আগাছা বেড়ে উঠেছে, সে সব ছেঁটে, নতুন করে জমি-জমার ব্যবস্থা করে এদের অবস্থা ভালো করতে হবে। তারপর তুমি যা চাইবে, পাবে।"

"আমাদের এখানে এত জমি প'ড়ে আছে. অথচ তাতে কোনো কাজ হচ্ছে না। সকলকে আজ তূলোর চাষ, চরকা-কাটা আর খদ্দর-বোনার কথা বলেছি। তারা খুব খুশী ; কিন্তু খেতে পায় না, তার উপর অসুখ বিসুখ—দোষ কি! এদের তালুক-গুলোকে ভালো করে দাও, প্রজাদের যা যা দরকার—করে

দাও, তাহলেই দেখো—এদের নিয়ে কি কাণ্ড আমি করে তুলি।”

“আমি তাই ভেবেছি মা, আর সে জন্যে দেবেনকে আসতে লিখেছি। এখানে থেকে মানুষ হয়েছে বলে এখানকার হাল আমাদের চেয়ে সে ভালো জানে। সে এলে তার সঙ্গে পরামর্শ করে কাজে হাত দেবো।”

কি মনে করিয়া অপর্ণা একটু ঔৎসুক্যের সহিত কহিল, “আচ্ছা বাবা, সে লোকটিকেও একবার সঙ্গে করে আনবার জন্য দেবুদাকে লিখলে না কেন?···তিনি যদি আসতেন—”

জীবনবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, “কোন্ লোকটি, মা?”

“সেই যে খদ্দর-প্রদর্শনীতে সকলকে যিনি চরকা-কাটা দেখিয়ে দিয়ে ঘরে ঘরে চরকা কাটবার কথা বলছিলেন? মনে নেই? সেই যে, দেবুদা বললেন, তিনি যদি বড় লোকের সাহায্য পান—তাহ'লে দেশে নতুন ব্যবসা গড়ে তুলতে পারেন।”

“হ্যাঁ রে, মনে পড়েছে।”

অপর্ণা বলিল, “তখন তাঁর কথা শুনে প্রদর্শনীতেই তুমি বলেছিলে, এ ছেলেটির মত যদি শতকরা পাঁচজন লোকেরও এমন উৎসাহ হয়, তা'হলে দেশে নতুন ব্যবসা গড়ে ওঠে, বাঙ্গালীর অনেক উন্নতি হয়। তারপর দেবু-দার কাছে তাঁর সম্বন্ধে কত কথা জিজ্ঞাসা করেছিলে! দেবু-দার সঙ্গে নাকি তিনি এক কলেজে পড়তেন,—দু'জনে খুব ভাব। বি, এ পড়তে পড়তে কলেজ ছেড়ে তিনি খদ্দর আর চরকা নিয়ে আছেন।”

—"তা সে এখন কোথায়—কি করছে, তা তো জানি না মা! আর বললেই বা সে আসবে কেন? তা ছাড়া এখন তার কোথাও কোনো কাজে রয়েছে কি না…"

অপর্ণা কহিল, "দেবু-দাকে লিখে তাঁর খোঁজ নাও না! এখানে তাঁর কাজের সুবিধা হবে। এলে আমরাও তাঁকে সাহায্য করতে পারি। দেবু-দা বলছিলেন, তিনি এমনি সুবিধাই খুঁজছেন।"

ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া জীবনবাবু কহিলেন, "বেশ কথা মা! এখানকার পতিত জমিগুলো কাজে লাগিয়ে যদি তেমন কারবার গড়ে তোলা যায়, মন্দ হয় না। আচ্ছা, দেবু আসুক, তার সঙ্গে পরামর্শ করে যা হয় করা যাবে।"

কিন্তু দেবেন্দ্র তখন কি কাজে আসিতে না পারিলেও তাহার হইয়া যে লোকটি আসিল, তার আগমন দৈবের মত ভবিষ্যতের সূচনা যেন!

* * * হপ্তাখানেক পরে একদিন বৈকালে দাসীকে সঙ্গে লইয়া অপর্ণা কোথায় যাইতেছিল, পথে লোকজন নাই, শুধু এক রাখাল গরুর সন্ধানে বাহির হইয়াছে, তাঁহাদের দেখিয়া সসম্ভ্রমে প্রণাম করিয়া পথ ছাড়িয়া রাখাল জিজ্ঞাসা করিল, "এই অ-বেলায় এদিক্ পানে কোথায় চলেছেন দিদিঠান্? এদিকে যে শ্মশান আর বন-বাদাড়—ভালো পথ নেই তো!"

"আমরা পদ্মঝিল দেখতে যাবো—তার পথ জানিস্?"

"ওমা, তা আর জান্বোনি!—সেখানে আজ-কাল খুব পদ্ম

ফোটে। ইষ্টিসানের পথে গেলে সোজা হবে!" বলিয়া রাখাল তাহাদিগকে লইয়া পতিত বাগান পার হইয়া ষ্টেশনের দিকে চলিল। ষ্টেশন সেখান হইতে এক ক্রোশের উপর। খানিক দূর আগাইয়া বাঁদিকে মোড় ঘুরিয়া একটা পড়ো ভিটার দিকে চাহিয়া রাখাল চীৎকার করিয়া উঠিল—"সাবধান দিদিঠান্! পাগলা ষাঁড় তেড়ে আসছে।"

একটা প্রকাণ্ড ষাঁড় সত্যই ছুটিয়া আসিতেছিল, রাখাল তাহার ছোট লাঠি লইয়া চীৎকার করিয়া বাধা দিতে গিয়া পড়িয়া গেল। ষাঁড়টা তাহাকে ছাড়িয়া দ্বিগুণ উৎসাহে অপর্ণার দিকে ধাবিত হইল।

এক দিকে পচা ডোবা, অন্য দিকে কণ্টকময় বেত-বন, চট করিয়া কোথাও পলাইবার উপায় নাই। ভয়ে দাসী চীৎকার করিয়া উঠিল এবং পাগলের মত অপর্ণার হাত ধরিয়া ছুটিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু ফল হইল বিপরীত! অপর্ণা পায়ে কাপড় জড়াইয়া বুড়িকে লইয়া সে পথের উপরে পড়িয়া গেল। ষাঁড়টা একেবারে তাহাদের উপর আসিয়া পড়িল।

আর একটু বিলম্বে দুর্দ্দশার সীমা থাকিত না! ভয়ে চীৎকার করিয়া অপর্ণা চোখ বুজিল। পর মুহূর্ত্তে গম্ভীর কণ্ঠে অভয় বাণী—"ভয় নেই!"

সঙ্গে সঙ্গে এক বলিষ্ঠ যুবা দৈব-প্রেরিতের মত আসিয়া ষাঁড়টাকে এমন বাধা দিল যে ভয়ে পিছন ফিরিয়া সে উর্দ্ধশ্বাসে পলাইল। সযত্নে অপর্ণাকে তুলিয়া যুবা জিজ্ঞাসা করিল, "কোথাও বেশী চোট লেগেছে?"

—"না।" বলিয়া অপর্ণা যুবকের মুখের পানে চাহিল। মুখ-খানা পরিচিত মনে হইল! কিন্তু ঠাহর করিতে পারিল না। মৃদু কণ্ঠে সে বলিল, "আপনি আমাদের দু'জনকে বাঁচিয়েছেন আজ! আপনি না থাকলে—"

যুবক কহিল, "বাঁচাবার মালিক ভগবান···আমি উপলক্ষ! কলকাতা থেকে আজ এসে নেমেছি। এখানকার জমিদার-বাড়ী কতদূর বলতে পারেন?"

দাসী কহিল "ওমা! তা জানোনি? ইনি তাঁর মেয়ে! কলকাতার কোত্থেকে আস্‌ছো গা?"

"আমার নাম সুধীন্দ্রনাথ বোস। দেবেনবাবু আছেন—দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ—আমি তাঁর কাছ থেকে আস্‌ছি।"

অপর্ণার সর্ব্বাঙ্গে ধূলা ও কাদা! ইনি দেবেন্দ্রর সেই বন্ধু! অপর্ণা বলিল—"ও! আসুন আপনি আমাদের সঙ্গে।"



দশম পরিচ্ছেদ

প্রতি বৎসর জমিদার-বাড়ীতে মহাসমারোহে দুর্গোৎসব হয় এবং সেই উপলক্ষে পাঁচদিন ধরিয়া যাত্রা-থিয়েটার, নাচ-গান, বাজি-বাজনা—আনন্দের স্রোত বহিয়া যায়।

হরগোপালবাবুর স্বর্গারোহণের পর দিন দিন বাড়ীর অবস্থা এমন শোচনীয় হইয়া উঠিতেছিল যে এ-বৎসর পূজার দিন যত আসন্ন হইতে লাগিল, গ্রামে গুজব রটিয়া গেল যে, জমিদার বাড়ীর অত ধুমের দুর্গোৎসব এ-বৎসর হইতে বন্ধ হইয়াছে।

এ গুজব-সৃষ্টির অনেকখানি কারণ ছিল।

সুধীন্দ্র যখন কাহারও কথা না মানিয়া সেদিন বৈকালের গাড়ীতে চলিয়া গেল, তখন কাহাকেও স্পষ্ট কিছু না বলিয়া গেলেও তাহার ভাব-ভঙ্গিতে অনেকে বুঝিয়াছে, বেচারী জন্মের মত চলিয়া গেল! চারিদিকে এই অপ্রিয় আলোচনা শুনিয়া রবীন্দ্রর মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল!

তরুণ যুবক—তখন পাঠ্যাবস্থা। পড়িয়া খেলিয়া হুজুগ করিয়া বেড়াইয়া স্ফূর্ত্তিতে দিন কাটাইয়া দেওয়া ছাড়া আর কিছুতে তাহার রুচি বা অনুরাগ নাই। সম্পত্তির চিন্তা দূরে থাকুক, মনে আসিলেও আতঙ্কে শিহরিয়া ওঠে। জিওমেট্রির একষ্ট্রার মত ব্যাপারটা তাহার কাছে এমন জটিল এবং শঙ্কাপূর্ণ

মনে হয়, ভবিষ্যতে কখনো তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে, এমন কথা সে ভাবিতে পারে না!

পূজা চুকিয়া গিয়াছে। পূজার ঝঞ্ঝাট, তাহার উপর সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ—গিরিশচন্দ্র আছেন সত্য তবু একটা চিন্তা রবীন্দ্রকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেছে। গিরিশচন্দ্র বর্ত্তমানে বাহিরের দিকে ভাবিবার কারণ না থাকিলেও অন্তঃপুরে জনশূন্যতায় সে কেমন বিমর্ষ হইয়া উঠিতেছিল। অত-বড় অন্দর-মহল খাঁ-খাঁ করিতেছে।

হঠাৎ একদিন গিরিশচন্দ্রকে ধরিয়া রবীন্দ্র বলিল—"দাদা চলে গেলেন। আমি এসব ঝক্কি পোহাতে পারবো না গিরিশদা!...বাড়ীতে কেউ নেই!"

গিরিশচন্দ্রও এ-সম্বন্ধে অনেক চিন্তা করিতেছিলেন;—রবীন্দ্রর কথায় তিনি মনে আঘাত পাইলেন। আশ্বাস দিয়া তিনি কহিলেন, "ভয় কি, আমার হাড় কখানা যতদিন আছে, তোমার কিছু ভাবতে হবে না। তুমি তোমার পড়া-শুনা নিয়ে থাকো। আর স্থধী? রাগ করে সে কোথায় যাবে? যেমন করে পারি, তাকে ফিরিয়ে এনে তার জিনিষ তাকে বুঝিয়ে দিয়ে তবে আমার ছুটি। তার আগে নয়।"

গিরিশচন্দ্র তাহাদের কতখানি আপনার, সে তাহা জানে; ছেলেবেলা হইতে তাঁহার কোলে পিঠে মানুষ হইয়াছে। তাঁহাকে যেমন ভয়, ভক্তি, শ্রদ্ধা করে—তেমনি আবার নিজের ভাবিয়া তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকে। গিরিশ-

চন্দ্রের আশ্বাসে মনে আশা জাগিল,—উৎসাহ-ভরে সে কহিল, "হ্যাঁ দাদা, তাই করো, ও-সব উইল টুইল ছিঁড়ে ফ্যালো। আমি কিছু চাই না। তোমরা আমাকে খেতে পরতে দিয়ো, আর হাত-খরচের জন্য কিছু কিছু টাকা দিয়ো। ব্যস! কিন্তু এখন—"

"এখন কি—বলো?"

"সংসার চলবে কেমন করে? বাড়ী-ঘর শ্মশানের মত খাঁ খাঁ করছে! বিলি-বন্দেজ নেই—ভারি গোলমাল। জনকতক ঝি চাকর ছাড়া এমন কেউ নেই যে, সংসার দেখে।"

কদিন ধরিয়া গিরিশচন্দ্রও এই কথাটা চিন্তা করিতেছিলেন, কিন্তু মীমাংসা করিতে পারেন নাই। রবীন্দ্রর কথায় চিন্তা আরও প্রবল হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কি করতে বলো, শুনি?"

রবীন্দ্র বলিল—"আজ একখানা চিঠি পেয়েছি—হালিসহরে বাবার যে মাসী আছেন, তিনি লিখেছেন!···বাবার শ্রাদ্ধের সময় তাঁর নাতির খুব অসুখ হয়েছিল, তাই আসতে পারেন নি। বাড়ীর কথা কার কাছে বুঝি শুনেছেন। শুনে তিনি লিখেছেন, যদি দরকার হয়, তা'হলে কিছুদিনের মত এসে ঘর-সংসার সব গুছিয়ে দিয়ে যাবেন।"

গিরিশচন্দ্র বলিলেন "তাঁকে আমি খুব জানি!···তিনি এলে কি হবে, জানো? শান্তির বদলে অশান্তি পোহাতে হবে! খুঁটি-নাটি ধরে বাড়ীর ঝি-চাকর থেকে তোমাকে আমাকে পর্য্যন্ত জ্বালিয়ে মারবেন। অনেক দিন আগে, তুমি তখন ছোট, তিনি একবার এসেছিলেন। মাসখানেকের মধ্যে

জ্যেঠাইমাকে কাঁদিয়ে, তবে বিদায় হন !…না রবি, ও ব্যবস্থা ভালো নয়।”

রবীন্দ্র কহিল—“কিন্তু সংসারের উপায় ?…চারধারে গণ্ডগোল ! আমি আর ভাবতে পারি না দাদা !…যা হয়. করো—”

কি করিবেন, ঠিক করিতে না পারিয়া গিরিশচন্দ্র হঠাৎ জবাব দিতে পারিলেন না।

রবীন্দ্র বলিল, “আচ্ছা, মিছিমিছি তোমাদের ও আলাদা বাড়ীতে থাকবার দরকার কি ? তুমি তো দুবেলা দুমুঠো খাবার সময় ছাড়া চব্বিশ ঘণ্টা এ-বাড়ীতে আছো !—আমি বলি, ও বাড়ী চাবি বন্ধ করে সোনাদিদিকে নি’য়ে এখানে এসে থাকো। এ-ও-তো তোমাদের পরের বাড়ী নয় ! আর সোনাদি এ বাড়ীর হাল-চাল যেমন জানে, তেমন আর কেউ জানে না। সে এসে যদি গিন্নি হয়ে বসে, তা’হলে কোনোদিকে গোলমাল থাকে না।” তারপর গিরিশচন্দ্রের হাত ধরিয়া মিনতির স্বরে বলিল—“তুমি তাই করো, দাদা।”

গিরিশচন্দ্রের মনে এ কথাটা না উঠিয়াছে এমন নয়, কিন্তু সুধীন্দ্রকে সোনা যে মনে-মনে কতখানি ভালোবাসে, জানেন বলিয়া ভরসা করিয়া সোনার কাছে এ-কথা পাড়িতে পারেন নাই। এখন রবীন্দ্রর কথায় কহিলেন, “সে কি রাজী হবে ?”

“কেন হবে না ?” রবীন্দ্র বলিল, “সোনাদি আমাদের পর নয়। ছেলেবেলা থেকে আমাদের কম ভালোবাসে ? তার চোখের উপর আমাদের সংসার নষ্ট হয়ে যাবে, সে দেখবে ?

কখনো না। তুমি যদি বলো, তা হলে আমি গিয়ে তাকে নিয়ে আসি।”

গিরিশচন্দ্রের মনে এক-একবার এ-কথা জাগিতেছিল, তবু সোনার অভিমানের দিক ভাবিয়া তিনি একটু ঘুরাইয়া জবাব দিলেন, “বেশ, তা যদি করতে পারো, করো।···চারিদিক তা'হলে বজায় থাকে।”

আর বলিতে হইল না, রবীন্দ্র তখনি সোনার কাছে গিয়া হাজির—ফিরিয়া আসিয়া যখন বলিল, সোনাদি রাজী—তখন গিরিশচন্দ্র আশ্চর্য্য হইলেও অসন্তুষ্ট হইলেন না!

যথাসময়ে রবীন্দ্র গিয়া সোনাকে লইয়া আসিল।

রাত্রে আহার করিতে গিয়া গিরিশচন্দ্র সোনাকে বলিলেন, “বুঝ্‌লে, সুধী তোমার অত উপরোধ ঠেলে চলে গেছে বলে তার উপর অভিমান করে তুমি যে রবির কথা ঠেলোনি—এখানে এসে সব ভার নেছো, এতে আমি ভারী খুশী হয়েছি।”

সোনা কহিল, “না এলে চলবে কেন? তিনি অভিমানে সব ভাসিয়ে দিয়ে গেলেও—”

“বুঝেছি।” বলিয়া গিরিশচন্দ্র হাসিলেন। হাসিয়া কহিলেন, “এতক্ষণে একটা দুর্ভাবনার হাত থেকে পরিত্রাণ পেলাম।”

“তা হ'লেও তুমি ছোট ঠাকুরমাকে আনতে অমত করো না। যত মন্দ হোক্, আমার চোখের উপর তিনি কারো অনিষ্ট করতে পারবেন না।”

"তা জানি সোনা-দি !" বলিয়া রবীন্দ্র গিরিশচন্দ্রের মুখের পানে চাহিয়া হাসিল।

তারপর সোনার ইচ্ছামত কাজ হইল। একদিন যুবক-নাতিকে সঙ্গে লইয়া ছোট-ঠাকুরমা এ গৃহে পদার্পণ করিলেন, করিয়া সোনার চিবুক ধরিয়া আদর করিয়া কহিলেন—"আহা, দেখি দেখি সেই নাত-বৌ—এমন গিন্নী হয়েছিস্! বেঁচে থাকো ভাই, পাকা মাথায় সিঁদুর পরো! আমি আর কদিন? আমার হারাধনের ভার তোদেরই নিতে হবে, এরপর।"

ঠাকুরমার কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে হারাধন আসিয়া কহিল, "হাঃ—হাঃ—হাঃ—ঘোমটা দিচ্ছ কেন গো? আমায় দেখে ঘোমটা টানলে চলবে না বৌদি। আমিও তা হলে তেমনি করে বলবো···দেহি পদমুদারং।" বলিয়া নিজের রসিকতায় নিজেই হাসিয়া খুন।

ঠাকুরমা সোনাকে কহিলেন, "তা নাত-বৌ, হারু আমার বড় মন-খোলা···আমুদে, ওর সঙ্গে হাসি-খুশী আমোদ-আহ্লাদ করো। * * *

কলেজে পড়িতে রবীন্দ্র কলিকাতায় গেল।

আট দশ মাসের মধ্যে এত ব্যাপার হইয়াছে, সোনার বাল্য-সখীদের অনেকেই তাহা জানে না। সেদিন হেমাঙ্গিনী শ্বশুর-বাড়ী হইতে আসিয়া সোনার কাছে সব কথা শুনিল।

সোনা বলিল "এতে যে যা বলুক আর মনে করুক, ভাই, আমার মনে হয়, এ আমার কর্ত্তব্য।"

"তোর এতে কি অধিকার, আর সে অধিকার দিলে কে ?" বলিয়া হেমাঙ্গিনী সোনার পানে তীব্র কটাক্ষে চাহিল।

তাহা গ্রাহ্য না করিয়া সোনা সহজ ভাবে স্পষ্ট জবাব দিল—"অধিকার এইখানে।" বলিয়া নিজের বুকে হাত দিয়া তারপর সে হাত উপরদিকে তুলিয়া কহিল, "এ অধিকার দেছেন একমাত্র যিনি দিতে পারেন···ঐ উপরওয়ালা !"

হেমাঙ্গিনী অনেকক্ষণ ধরিয়া বিস্মিত দৃষ্টিতে সোনার পানে চাহিয়া রহিল, তারপর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল—"তা হলে সুধী বাবুকে তুই এখনও ভালোবাসিস্ ! কিন্তু তোর স্বামী···"

তাহাকে কথা শেষ করিতে না দিয়া সোনা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, কহিল, "কেন ! তাঁর উপরও আমার কর্ত্তব্য—তার কোনো ত্রুটি আমি রাখিনি ! তাঁর সঙ্গে কোনোদিন প্রতারণা করিনি ! আমার মনের কোনো ব্যথা তাঁর কাছে কিছু গোপন রাখিনি ! তুই বিশ্বাস করবি এ-কথা ? মনের কথা অকপটে বলছি···"

হেমাঙ্গিনী অনেকখানি বিস্ময় লইয়া প্রস্থান করিল ; কিন্তু সোনার মনে কোনো গলদ নাই।

ইহার দিন তিনেক পরে পূজার খুব কাছাকাছি ছোট-ঠাকুরমা বিরক্ত হইয়া সোনাকে কহিলেন, "হ্যাঁ বাছা—এ-সব তোমরা কি করছো ? চিরকাল ধরে পূজোর সময় এ-বাড়ীতে বাই-খ্যাম্‌টা নাচ-গান হয়ে আসছে, আর আজ তুমি উড়ে এসে

জুড়ে বসে সে সব বন্ধ করে চারদিন খালি কাঙাল-গরীব খাওয়াবে? এমনি করে টাকাগুলো নয়ছয় করা কেন, শুনি?"

গম্ভীর স্বরে সোনা জবাব দিল—"মাপ করো ছোট-ঠাকুরমা! আমি তা বলতে পারবো না।"

ছোট ঠাকুরমা ঝঙ্কার তুলিলেন, "বলতেই হবে তোমাকে। হারু আমার আজ সাতদিন ঘুরে ঘুরে বাই-খ্যামটা ঠিক করে এলো, আর তুমি কি না খালি কাঙালী খাওয়াবে? বাই-খ্যামটা হবে না? আচ্ছা, দেখি কার কথা থাকে।"

* * * রবীন্দ্র তখনও কলিকাতা হইতে আসে নাই।



একাদশ পরিচ্ছেদ

"হারু-দা, এবার তোমার বাহাদুরি বোঝা যাবে! এ কাজে যদি হেরে যাও দাদা, তা'হলে আড্ডার সকলে দেবো হাততালি—হ্যাঁ, হ্যাঁ!" বলিয়া গাঁজার কলিকায় সজোরে একটা টান দিয়া নিতাই হারাধনের দিকে কলিকা ধরিল।

কলিকা হাতে লইয়া হারাধন তলায় ন্যাকড়ার ফালিটা দুরস্ত করিয়া লাগাইয়া, দু-তিনটা টান দিয়া কলিকা হস্তান্তর করিবার সঙ্গে সঙ্গে একটু চুপ করিয়া রহিল, তারপর ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিল, "হুঁ হুঁ বাবা, তেমন ছেলে আমায় পাওনি! হারু হারবার পাত্র নয়! এই ছ'মাসের ভেতর গাঁ কেমন গুল্‌জার করে তুলেছি! আগে তোরা হাট-তলায়, পুকুর-পাড়ে ঘুরে মর্‌তিস—এখন ক্যায়সা বৈঠকখানায় তাকিয়া ঠেশ দিয়ে—···হেঁ হে বাবা—এখানে কোনো শালার টঁ্যা-ফোঁ করবার জো আছে?" বলিয়া হারু তবলা-বাঁয়া জোড়া কোলের কাছে টানিয়া লইতে লইতে আবার কহিল, "বাপ্, আগে ঐ গিরিশবাবুর ভয়ে এখানে কেউ ঘেঁষতে পারতো? মেয়েদের ঘাট-সরবার পথ বলে এই ঘরে দরোয়ান মোতায়েন থাকতো, এদিকে কেউ এলে তার মান রাখতো না। আসল ঘরটা আগে দখল করে বৈঠকখানা জাঁকিয়ে তুলেছি।" হাসিয়া হারাধন একটা কটাক্ষভঙ্গি করিল। বন্ধুর দল তাহাকে বাহবার উপর বাহবা দিতে ছাড়িল না।

ভোঁদা এতক্ষণ একধারে বসিয়া ঝিমাইতেছিল। বন্ধুদের উল্লাসের চীৎকারে চম্‌কাইয়া সে কহিল, "কি বাবা, চায়ে ঘাই দিয়েছে নাকি? এত ফুর্‌তি! দে বাবা, চার দে, ভালো করে চার খাওয়া। ও বাবা তেওয়ারের মেয়ে, কম নয়।" বলিয়া ভোঁদা গলার সুর ধরিল—

ওই আঁখি রে!
ফিরে ফিরে চেয়োনা চেয়োনা—ফিরে যাও
কি আর রেখেছো বাকিরে!

প্রত্যহ দুপুরের পর হইতে রাত্রি প্রহর-দেড়েক পর্য্যন্ত এ ঘরে গ্রামের যত বখাটে ছেলেদের লইয়া হারাধন এমন আড্ডা জমাইয়া তুলিত যে, গ্রামের ঝি-বউদের এ পুকুরে আসা দায় হইয়া পড়িয়াছে। সেজন্য গিরিশচন্দ্রের কাছে অনুযোগ বড় কম আসে না। নাতি-ঠাকুরমা সবে সাত-আট মাস আসিয়াছে এবং হারাধন তাঁহার অগোচরে এ ঘরখানি আব্দার করিয়া চাহিয়া লইয়াছে বলিয়া তিনি ইহাতে হস্তক্ষেপ করেন নাই। ব্যাপার যখন এমন হইয়াছে, তখন তিনি আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। হারাধনের ঠাকুরমাকে কহিলেন, "ছোটঠাকুরমা তোমার হারাধনের দিকে যদি একটু নজর না রাখো, তাহলে তো আর পেরে উঠিনে বাপু!"

কথাটাকে বিপরীতভাবে গ্রহণ করিয়া ছোট-ঠাকুরমা মনে মনে তাতিয়া বিরক্তিভরে প্রশ্ন করিলেন, "কেন, সে তোমার বুকে ভাতের হাঁড়ি নামিয়েছে নাকি?'

গিরিশচন্দ্র গম্ভীর হইয়া জবাব দিলেন, "তা এখনো পারেনি, তবে—"

ঠাকুরমার আর শুনিবার ধৈর্য্য রহিল না, গিরিশচন্দ্রের কথা শেষ হইবার আগেই হাত-মুখ নাড়িয়া তিনি ঝঙ্কার তুলিলেন, "বাপরে! কেন? কে কি করতে পারে তার—করুক, দেখি।"

"সে লোকের অভাব এখানে নেই ঠাকুমা! তুমি চটো না, আমি ভালো কথাই বলতে এসেছি। কোথায় কাজ-কর্ম্ম শেখবার চেষ্টা করে নিজের আখেরের পথ করবে, তা নয়—যত বখাটে ইয়ার নিয়ে বেকুবের হদ্দ হচ্ছে! ভালো কথায় তাকে এই বেলা শোধরাও।"

কথাগুলা ঠাকুরমার বরদাস্ত হইল না। এখানে আসিয়া অবধি বিষয়-ব্যাপারে গিরিশচন্দ্রের এবং সাংসারিক ব্যাপারে সোনার একাধিপত্য দেখিয়া এই দুটি মানুষের উপর দারুণ আক্রোশে তিনি জ্বলিয়া আছেন! গিরিশচন্দ্রের উপদেশের আসল অর্থ, না বুঝিয়া তিনি অন্য অর্থ বুঝিলেন,—গর্জ্জনে বাড়ী কাঁপাইয়া তিনি কহিলেন,—"ওরে আমার ভালো-করনেওলা, কি আমার সাতপুরুষের কুটুম রে! গায়ে ভারী জ্বালা ধরেছে, না? কোন্ বেটা-বেটির সে ধার ধারে যে, তাকে শাসন করতে চায়? হারু আমার তার ভায়ের বাড়ীতে আছে। যা খুশী করবে! সে কারো হাত-তোলায় নেই তো যে, চোখ-রাঙ্গানিতে ভয় পাবে! কার ঘাড়ে দুটো মাথা আছে তাকে অপমান করে, শুনি?" বলিয়া ব্যাপারটাকে এমন করিয়া তুলিলেন, গিরিশচন্দ্রের সর্ব্বাঙ্গ জ্বালা করিতে লাগিল। কেলেঙ্কারীর ভয়ে তিনি

অতি কষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়া সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন।

গিরিশচন্দ্র প্রস্থান করিলে ব্যাপারটা এই খানেই থামিল না। উচ্চৈঃস্বরে সোনাকে শুনাইয়া ঠাকুরমা এমন সব অপ্রিয় কথা বলিতে লাগিলেন যে, সোনা আর থাকিতে না পারিয়া বাহিরে আসিয়া কহিল, "কি হচ্ছে ঠাকুমা? ছি ছি ছি, থামো, ভদ্রলোকের বাড়ী—এমন গলাবাজি করো না।"

ঠাকুরমা থামিলেন না, বারুদের মত জ্বলিয়া গর্জ্জিয়া উঠিলেন, 'কেন, ভয় নাকি? কি করবি তুই? ওরে আমার ভদ্দর নোকরে! ভারী ইজ্জৎ-উলীরে, মুখ নেড়ে কথা কইতে লজ্জা করে না? নিজের সাতগুষ্ঠীকে হজম করে দুজনে মিলে এখন আমার ভাগ্‌নের সর্ব্বস্ব পেটে পোরবার জন্য এখানে সেঁধিয়েছিস্!"

সোনার দু'চোখ দিয়া যেন আগুন ঠিকরাইয়া পড়িল—অতি কষ্টে নিজেকে সম্বরণ করিয়া গম্ভীর ভাবে সে কহিল,—"মুখ সামলে কথা কয়ো বাছা, ফের যদি অমন কথা বলবে তো ভালো হবে না।" বলিয়া তখনি সেখান হইতে চলিয়া গিয়া সুধীন্দ্রর ঘরে ঢুকিয়া দরজা ভেজাইয়া দিল। এই ঘরটা সোনা কাহাকেও ব্যবহার করিতে দেয় না, প্রত্যহ নিজের হাতে ঝাড়িয়া মুছিয়া চাবি বন্ধ করিয়া সে-চাবি নিজের আঁচলেই বাঁধিয়া রাখে।

মনে বিশেষ ব্যথা পাইলে সোনা এই ঘরে আসিয়া নিজেকে সামলাইয়া লয়, গিরিশচন্দ্রের তাহা অবিদিত নয়। ঘণ্টাখানেক

পরে দরজা ঠেলিয়া ভিতরে আসিয়া তিনি ডাকিলেন, "শুন্‌চো, সোনা···"

কাঁদিয়া কাঁদিয়া সোনার দু'চোখ রাঙা হইয়া ফুলিয়া উঠিয়াছে। চোখ মুছিতে মুছিতে সে বলিল,—"কেন ?"

গিরিশচন্দ্র কহিলেন,—"এ রকম করে তো' আর থাকা যায় না। সাধ করে ভালো বিপদ যেচে ঘাড়ে নিয়েছি! আট-দশ মাস এসেছেন—যা করছেন, ক'দিন আর চুপচাপ থাকি ?"

উদাস দৃষ্টি মেলিয়া সোনা কহিল—"কি করতে বলো ?"

"ওদের আবার দেশে পাঠাবার ব্যবস্থা করি।"

"যদি যেতে না চায় ?"

"সে বুঝবোখন !"

কি ভাবিয়া সোনা কহিল, "না। তা এখন করো না। এত সয়েছো, আরো দিনকতক দেখ, রবি আগে বাড়ী আসুক।"

"তারও ভাব-গতিক বুঝতে পারছিনা। খুব সম্ভব সেখানে তার মতি-গতি বেশ বিগড়ুতে সুরু করেছে। এদের সম্বন্ধে এতবার এত কথা লিখলাম, তার এমন এমন ভাসা-ভাসা জবাব দেয়,—পড়ে মনে হয়, সে যেন গা ঘামায় না!"

"তবু আর-কিছুদিন ছাখো!"

"আমি আমার জন্য বলিনি সোনা, এ সব গ্রাহ্য করতে গেলে এত বড় জমিদারী বজায় রাখতে পারতাম না! আমার ভাবনা তোমার জন্য,—এমন অকারণে নিত্য তোমার খোয়ার হবে, আর তুমি কেঁদে-কেটে অশান্তি ভোগ করে দেহ মাটী করবে—এ আমি সহ্য করবো না।"

"কিন্তু উপায় কি ?"

"উপায় আছে। চলো, আমরা নিজেদের বাড়ীতে ফিরে যাই।"

"তা হলে তো ওরা মস্ত সুযোগ পাবে! দু'হাতে লুট্‌তে পারবে।"

"যাদের জিনিষ, তারা যদি না দেখে, আমরা কি করবো তার ?"

সোনা বুঝিল, এমন কিছু ঘটিয়াছে, যাহার জন্য গিরিশচন্দ্র মনে কিছু আঘাত পাইয়াছেন। হঠাৎ সুধীন্দ্রর কথা মনে পড়িল। সোনা কহিল—"আরো কিছুদিন থাকো, এত বড় সংসার কার ঘাড়ে ফেলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হবো, বলো ?"

গিরিশচন্দ্র কহিলেন—"এই জন্যই এতদিন তোমায় কিছু বলিনি। কিন্তু এখন ভাবছি, একবার ভালো করে সুধীর সন্ধান নেবো।"

সোনা বলিল, "যদি সম্ভব হয়, তা হলে সেই চেষ্টাই করো।"

গিরিশচন্দ্র কহিলেন—"তা হলে এবারকার এই পূজো পর্য্যন্ত এ বাড়ীতেই থাকো। কিন্তু রবির চিঠি দেখেছো ?—নিশ্চয় অধঃপাতে চলেছে—নাহলে আমাকে এমন চিঠি লিখতে সাহস হবে কেন ? আমায় চেনেনি এখনো! ও জানে না দাঁড়িয়ে আছে কিসের উপর ভর করে! লিখেছে—"এই ঝগড়াঝাঁটি কেলেঙ্কারী কেন হয়, বুঝতে পারছি না! যাহোক আপনি আর ওদের কোনো-কিছুতে থাকবেন না। সোনাদিদিকেও বারণ করে দেবেন।"

সোনা বলিল, "এ তার লেখা নয়,—কক্‌খনো না। চিঠি দেখি! না, হ্যাঁ, তার হাতের লেখা! কিন্তু কেমন যেন—"

গিরিশচন্দ্র কহিলেন, "আমার সন্দেহ হচ্ছে খুব, সোনা। বাবুর চিঠি পড়া বা লেখা দূরে যাক্, সই করবার ভারটুকুও পরের হাতে! তা যদি সত্যই হয়ে থাকে সোনা, তা'হলে তার ভাগ্যে—" বলিয়া কথাটা শেষ না করিয়াই তিনি এমন ভঙ্গী করিয়া প্রস্থান করিলেন যে, তাহা দেখিয়া সোনার বুক কাঁপিয়া উঠিল।

* * * *

দিন পনেরো পরে হারাধন আসিয়া ঠাকুরমার কাছে চুপিচুপি কহিল—"ভাগ্যে তুমি টিপে দিয়েছিলে ঠাকুরমা, নাহলে সেদিনের পর থেকে আর আমরা ও বৈঠকখানায় ঢুকতে সাহস করতাম না! লোকটা যেন কেঁদো বাঘ।"

ঠাকুরমা কহিলেন—"তেমনি ফাঁদও আছে! সে ফাঁদ আমার হাতে! তোরা ভয় করিসনে। আমোদ-আহ্লাদ করিস্। সত্যই তো, এত টাকা ওরা পাঁচ ভূতে লুটে খাবে? আর তুই আপনার জন হয়ে কষ্ট পাবি। ওদের কি ক্ষমতা—কি ওরা করবে? মহেশ ঘোষ আমার হাতে, যে মকর্দ্দমার ছুতো করেছে। হপ্তায় হপ্তায় কলকাতায় যাচ্ছে, সে কি আর ধান ভানতে? রবেটা হাতে এলো বলে। গিরিশকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করে তোকে যদি ওর কাজ না দেওয়াতে পারি, তো—হ্যাঁ।"

ঠাকুরমার কথায় উৎসাহিত হইয়া হারাধন তার উচ্ছৃঙ্খলতা এমন বাড়াইয়া তুলিল যে, চার-পাঁচ দিন পরে বুনো তেওর আসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গিরিশচন্দ্রের কাছে নালিশ জানাইল, "হুজুর মা বাপ! এতকাল রাম-রাজত্বিতে বাস করছি, কখনো কারো নামে নালিশ-ফরেদ করতে হয়নি! কিন্তু এখন হুজুর, ওই হারুবাবু এসে ইস্তক আমাদের বৌ-ঝির ইজ্জৎ বাঁচানো দায় হয়ে উঠেছে! ওই যে ঘাটের ধারে আড্ডা-ঘর, ওখান দিয়ে আর মেয়েছেলের পুকুরে যাবার উপায় নেই।" বলিয়া এমন কতকগুলি ঘটনা বিবৃত করিল যে গিরিশচন্দ্র রাগ বরদাস্ত করিতে পারিলেন না, তখনি দুজন দরোয়ানকে সঙ্গে লইয়া নিজে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। নেড়া সবে একটা বোতল খুলিয়া উৎসাহে গেলাসে ঢালিবে, সামনে হঠাৎ কৃতান্তের মত গিরিশচন্দ্রকে দেখিয়া কাঠ হইয়া গেল! হারাধন চক্ষের পলকে জানলা টপকাইয়া এমন সরিয়া পড়িল যে, কোথাও আর তাহার খোঁজ-খবর মিলিল না। গিরিশচন্দ্র আসবাব-শুদ্ধ আড্ডাঘর স্বহস্তে চাবি বন্ধ করিয়া ফিরিয়া আসিলেন।

হারাধন রাত্রেও ফিরিল না। ঠাকুরমা কাঁদিয়া কাটিয়া শাপমন্নি দিয়া, সারা রাত বাড়ীর কাহাকেও ঘুমাইতে দিলেন না। ঠাকুরমা পরদিন গোপনে সংবাদ লইয়া শুনিলেন, ভোরের গাড়ীতে মহেশ ঘোষের সঙ্গে হারাধনকে স্টেশনের পথে যাইতে দেখা গিয়াছে। ঠাকুরমা সকলকে শুনাইয়া দিবার জন্য চীৎকার করিয়া বকিতে লাগিলেন,—

"এখনো ধর্ম্ম আছে! পৃথিবীতে দিন রাত হচ্ছে। যাবে কোথায়? পরের ধন হজম করা অমনি নয়! আসুক হারু বাড়ী ফিরে, তখন যা করবো···সকলে দেখবে।"

* * * হপ্তাখানেক পরে কলিকাতা হইতে ফিরিয়া হারাধন চুপি চুপি ঠাকুমাকে বলিল—"বাজিমাৎ ঠাকুমা! রবি ঢুকু-ঢুকু স্থরু করেছে। ব্যস্! কুচ্ পরোয়া নেই! পূজোয় ও সব কাঙ্গালী-ভোজন ড্যাম্‌কেয়ার হয়ে গেছে। আমি নিজে ঘুরে ভালো ভালো খ্যাম্‌টাউলী বায়না করে এসেছি। তাদের সঙ্গে নিয়ে রবি নিজে এসে হাজির হবে। আর সঙ্গে সঙ্গে কৈফিয়ৎ তলব!···তুমি কোনো কথা কয়ো না, একটু চেপে থাকো। সে এলে তখন সিদ্ধিনমো বাজী হয়ে যাবে!"

নাতি সাবধান করিয়া দিলেও আনন্দের আতিশয্যে ঠাকুরমা চুপ করিয়া থাকিবার মানুষ নন—পরের দিন সকলের কাছে গিয়া খ্যাম্‌টা-বায়নার সুসংবাদ প্রচার করিলেন।



দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

মহেশ ঘোষ আর হারাধনের ঠাকুরমা—এক গ্রামের মানুষ—ঠাকুরমার সে একটু অনুগত।

মাতামহের পরিত্যক্ত সামান্য কিছু সম্পত্তি পাইয়া মহেশ যখন হালিসহরের পৈতৃক ভিটা হারাধনের ঠাকুরমার জিম্মায় রাখিয়া রতনগড়ে ছিলেন, তখন তাঁহার কন্যার বয়স এগারো ছাপাইয়া উঠিয়াছে। হারুর পিত মহীর মুখে হরগোপালের সংসারের সকল কথাই তিনি শুনিয়াছিলেন ; এবং গিরিশচন্দ্রের মত গুণবান জামাতার আশায় হরগোপালের মোসাহেবী করিয়া আত্মীয়তা স্থাপন করিতে তিনি বিলম্ব করেন নাই। হরগোপালও তাঁহার মনের ভাব বুঝিয়া বলিয়াছিলেন—"এত ব্যস্ত হচ্ছো কেন ঘোষজা ? আমার ইচ্ছা সুধী আই-এ পাশ করলে তার আর গিরিশের বিয়ে একসঙ্গেই দেবো।"

মহেশ ঘোষ সেদিন তাঁহার কথায় আশান্বিত হইয়া বলিয়াছিলেন—"গরীব মানুষ আমরা—হুট বলতে সব জোগাড় করে উঠতে পারবো না তো ! এখন যদি মেয়েটাকে একবার দেখে কথাবার্ত্তা স্থির করে রাখতেন···"

হাসিয়া হরগোপাল বলিয়াছিলেন—"গিরিশের সঙ্গে যদি তোমার মেয়ের বিয়ে হয়, তা'হলে জোগাড়-যন্ত্রের জন্য তোমায় ভাবতে হবে না হে ! শুধু মেয়েটির হাত ধরে সম্প্রদান করো। আর যা কিছু, সে ভার আমার।"

এই পর্য্যন্ত। ইহাকে পাকা কথা ভাবিয়া মহেশ ঘোষ সগর্ব্বে কথাটা দেশে রাষ্ট্র করিয়াছিলেন এবং পরে অন্য জায়গা হইতে যাহারা মেয়ে দেখিবার জন্য আনাগোনা করিতেছিল, তাহারা প্রত্যাখ্যাত হইয়া আর এধার মাড়ায় নাই।

মহেশ ঘোষের পাহাড়-প্রমাণ সে-আশা এক দিনে খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল—যখন সোনার সহিত গিরিশচন্দ্রের বিবাহ হইল।

তাহার পর হইতে দীর্ঘকাল ধরিয়া মেয়েকে পাত্রস্থ করিবার জন্য বেচারীকে সত্যই বড় বেগ পাইতে হইয়াছে। লোকের দোরে দোরে ঘুরিয়া, লাঞ্ছনা-অপমানের ধাক্কা সহিয়া মহেশের দুর্দ্দশার অন্ত ছিল না। তিনি পণ করিলেন,—জমিদার হরগোপালের বংশকে অপমানিত, পীড়িত এমন কি শক্তিতে কুলাইলে বিধ্বস্ত করিতে হইবে। সেই জন্যই কলিকাতায় যাওয়া-আসা করিয়া সরল তরুণ রবীন্দ্রকে সর্ব্বনাশের নেশায় মাতানো—যেন তাঁহার ধ্যান-জ্ঞান হইল! কলিকাতায় সুধীন্দ্রর বাসাতেই চাকর ও রাঁধুনি লইয়া রবীন্দ্র থাকে। পাঁচজনের সঙ্গে মেসের বাসায় থাকিলে পাছে বখিয়া যায়, এই ভয়ে খরচ বেশী হইলেও গিরিশচন্দ্র এ ব্যবস্থা করিয়াছেন। তা ছাড়া তাঁর মনে আশা আছে, যে-বাসাতে এতকাল থাকিয়া সুধীন্দ্র পড়া-শুনা করিয়াছে, সেখানে লোকজন থাকিলে হয়তো বা একদিন সুধীন্দ্রর সন্ধান মিলিতে পারে! কিন্তু তাঁহার সে আশা সফল হইল না, অধিকন্তু ফল দাঁড়াইল বিপরীত। রবীন্দ্র অধঃপাতের পথে নামিতে লাগিল।

মহেশ ঘোষ নিজের মামলার অছিলায় গিয়া সপ্তাহের বেশীর ভাগ কলিকাতায় রবীন্দ্রর বাসায় অধিষ্ঠান করিতেন, গিরিশচন্দ্র বা সোনা তাহা জানে না। হারাধন এবং ঠাকুরমার চেষ্টায় সংসারের দৈনন্দিন খুঁটিনাটির সংবাদটুকুকে কেন্দ্র করিয়া মহেশ ঘোষ এমন অলীক কাহিনী পল্লবিত করিয়া রবীন্দ্রকে শুনাইতে লাগিল যে—রবীন্দ্রর প্রমোদ-পিয়াসী তরুণ মন তাহা ঠেলিয়া দিবার জন্য অস্থির হইয়া উঠিল!

ইহার উপর মহেশ ঘোষের মিথ্যা লাগানি আর ঠকামি, গিরিশচন্দ্র দুটি ভাইকে দূরে রাখিয়া কি মতলব না হাসিল করিতেছে! কিন্তু গিরিশচন্দ্র বুদ্ধিমান—এখানে তিনিই সর্ব্বেসর্ব্বা! রাইয়ৎ লোক তাঁহাকেই জানে, তাঁহাকেই মানে। গিরিশচন্দ্র এমন কলকাঠি টিপিবেন যে রবীন্দ্র পরে নিজের জমিদারীতে নিজে পাত্তা পাইবে না!

ইহার উপর মহেশ ঘোষের দীর্ঘনিশ্বাস! রবীন্দ্রকে কেবলি বলেন—"সহরের ঐ উড়ে বামুন—ওর রান্না তোমার মুখে রোচে কখনো বাবা! কি-ঘরের ছেলে—কি রাজভোগ খাওয়া অভ্যাস!···আমি বলি, আমার এক ভাগনী আছে, তার কেউ কোথাও নেই···বিধবা হয়েছে···কালীঘাটে থাকে পিসশাশুড়ীর কাছে—তাকে নিয়ে আসি। সংসার দেখার কাজে মেয়েমানুষ যেমন পোক্ত হয়, এমন আর কেউ নয়, বাবা। তার উপরে গৌরী আমার আপন ভাগনী। ভারী ভালো মেয়ে। যত্ন-আত্তি করবে—দেখবে-শুনবে। তুমি

তাতে আরামে থাকতে পারবে···সে-ও বর্ত্তে যাবে। এমন আশ্রয় সে পাবে! যদি বলো, তাকে আনি! কেমন?”

বদান্যতার ভাণ করিয়া মহেশ ঘোষ এমন আশ্বাস দিতেছেন, আরো নানা ভাবে আত্তিশো জানান! তাঁহার প্রস্তাবে রবীন্দ্র না বলিতে পারিল না। সে বলিল—“বেশ।”

উড়িয়া বামুনকে বিদায় দিয়া তার আসনে এখন বসিয়াছে গৌরী। গৌরীর যৌবনের নদীতে সবে ভাঁটার টান ধরিয়াছে। পরণে থান···পরিষ্কার কাচা—মাথার চুলগুলা পরিপাটী-ছাঁদে বাঁধা—লাবণ্যময়ী···মুখে চোখে বুদ্ধির দীপ্তি! উড়িয়া বামুনের চেহারা—আর এই গৌরীর! গৌরীকে রবীন্দ্রর ভালো লাগিল। গৌরীকে এখানে বাহাল করিয়া মহেশ ঘোষ দেশে ফিরিলেন। গৌরী ধরিল এখানে সংসার-তরণীর হাল। এবং দুদিনেই চারিদিকে এমন শৃঙ্খলা পারিপাট্য—রবীন্দ্র মুগ্ধ হইল।

রবীন্দ্রর পরিচর্য্যায় গৌরীর কি লক্ষ্য! স্নান করিতে যাইবে, তেলের বাটি আনিয়া দেয়। স্নানের ঘরের সামনে দাঁড়াইয়া থাকে, স্নান করিয়া যেমন বাহিরে আসে—নিজের হাতে রবীন্দ্রর মাথা চিরুণী দিয়া আঁচড়াইয়া দেয়! এ বয়সে রমণীর হাতের পরিচর্য্যা—রবীন্দ্রর এত ভালো লাগে! সে ভাবে, যেন বোনের মত! গৌরীদি তার জীবনে এমন বিজড়িত হইল যে তার সঙ্গে বসিয়া সমস্ত পরামর্শ। গৌরী হইল সাথী সহচরী···এখানকার সর্ব্বময়ী!

একদিন মহেশ ঘোষ আসিয়া কহিলেন—"কি বাবা, খাওয়া-দাওয়া হচ্ছে কেমন ? রাঁধে ভালো ?"

রবীন্দ্র কহিল—"খুব ভালো।"

মহেশ ঘোষ মনে মনে হাসিলেন,—ঔষধ ধরিয়াছে।

এমনিভাবে সূচনা—তারপর গিরিশচন্দ্র ও সোনার বিরুদ্ধে একটি একটি করিয়া মহেশ ঘোষ বিষ ঢালিতে সুরু করিলেন। মনে তখন রঙের ছোপ—গৌরীর মামা মহেশ ঘোষ এবং গৌরীর যত্ন-আদর! যথাসময়ে চা এবং সুগন্ধি সরবৎ। রবীন্দ্র ভাবে, বাসা নয়, স্বর্গ··· গৌরী নয়, দেবী!

মহেশ ঘোষ ইহাই চাহিতেছিলেন। তারপর গৌরীর হাত দিয়া ক্রমে সঞ্জীবনী সুধার পাত্র ধরিয়া দেওয়া···মদিরা!

ঠিক এই অবস্থায় রবীন্দ্রর সে-পত্র—মহেশ ঘোষের রিপোর্ট এবং মহেশ ঘোষের লেখা কথাগুলা—রবীন্দ্রর কথা বলিয়া জানানো! চিঠির উপরে সহিটি শুধু রবীন্দ্রর।

পূজার পূর্ব্বে ব্যাপার যখন গুরুতর দাঁড়াইল এবং গিরিশচন্দ্রের চিঠির উপর চিঠি আসে, তখন সে চিঠি এবং সে-চিঠির এক হপ্তা পরে হারাধনকে সঙ্গে করিয়া মহেশ আসিয়া উপস্থিত।

মহেশ কহিলেন—"শুনেছো বাবা, তোমাদের নতুন কর্ত্তা-গিন্নী এবার পূজোয় নাচ-গান বন্ধ দিয়ে শুধু কাঙ্গালী-ভোজনের ব্যবস্থা করেছেন! এত কালের নাম-ডাক—"

সুরায় রবীন্দ্রর মাথা তখনো ভোঁ ভোঁ করিতেছে—সে বলিল—"নো—নেভার! তুমি যাও হারু-দা, এখনই মহেশ

খুড়োকে সঙ্গে নিয়ে ভালো ভালো দেখে খেম্‌টা বায়না করে এসো। একদম্ খাপ্‌সুরৎ—হাম্ দেখেগা, কে কি করতে পারে!"

নেশার ঝোঁকে হুকুম। নেশা কাটিলে রবীন্দ্রর মনটা চম্‌কাইয়া উঠিল! গিরিশচন্দ্রের ভয় রবীন্দ্রর মন হইতে তখনও একেবারে মুছিয়া যায় নাই। মহেশকে সে বলিল—"হারু-দাকে সাবধান করে দিয়েছো তো? এখানকার কথা ওখানে যেন না জানতে পারে!"

"ঘাব্‌ড়ো না বাবা!—বলি, সম্পত্তির মোটামুটি খবরটা জানা আছে তো?"

"কিছু না, বাবা!"

মহেশ ঘোষ চিন্তিত হইলেন, তারপর কহিলেন, "আচ্ছা, কালেক্টরীর রেকর্ড আছে—সার্চ করলেই পাওয়া যাবে। দেখে-শুনে নেওয়া উচিত। কথায় বলে, পর-হস্তে ধন···ভালো কথা নয়।"

"সে সব পরের কথা। এখন এদিককার ব্যবস্থা করো খুড়ো—দু একটা কেস সঙ্গে নেওয়া চাই!" বলিয়া সে গান ধরিল—

—"ও আমার আদরিণী প্রাণ,
চলে যাবো গঙ্গাস্নান!
হাটখোলাতে তোমায় আমায়
খাবো পাকা পাণ!
ও আমার—"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ জীবনবাবুর জ্ঞাতি-পুত্র—মেডিকেল কলেজের সদ্য-পাশ করা ডাক্তার! সংসারে অতি-আপনার বলিতে বিশেষ কেহ না থাকিলেও জীবনবাবুর বিশেষ স্নেহের পাত্র এবং জীবনবাবু দেবেন্দ্রকে অর্থ সাহায্য করেন। পড়া-শুনার জন্য কলিকাতায় তাহার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হইত কম। যখন এলাহাবাদে থাকিত, জীবনবাবু ও অপর্ণার সঙ্গে দেবেন্দ্রর তখন হইতে বেশ অন্তরঙ্গতা!

এখন ডাক্তারী পড়া শেষ হইলে কাজকর্ম্মের জন্য তাহাকে কলিকাতায় থাকিতে হয়। কলেজে পড়ার সময় হইতেই সুধীন্দ্রর সহিত দেবেন্দ্রর বন্ধুত্ব ঘটে।

দেবেন্দ্র প্রথমে মেসে থাকিয়া পড়াশুনা করিত। সৌহার্দ্দ্য গাঢ় হইলে সুধীন্দ্র বলিল—"মিছিমিছি মেসে থাকা কেন দেবী? এ বাড়ীতে আয়! দুজনে আরামে থাকবো।"

সেইদিন হইতে দুজনের মধ্যে যেটুকু ব্যবধান ছিল দূর হইয়াছে।

আশৈশব সাথী সোনাকে জীবন-সঙ্গিনী রূপে না পাইয়া সুধীন্দ্রর সোনা-হারা বুকে যে আঘাত লাগিয়াছে, সে আঘাতের কথা জানে শুধু দেবেন্দ্র—বিশদভাবেই জানে।

স্বর্গগত পিতার অন্যত্র বিবাহ দিবার চেষ্টা, কন্যাপক্ষের আশীর্ব্বাদ এবং তাহা হইতে অব্যাহতি-লাভ—এ সবে দেবেন্দ্র

ছিল তাহার সহায়। অবশেষে সোনার বিবাহ হইয়া গেলেও, না-পাওয়ার বেদনা হইতে রক্ষা করিতে দেবেন্দ্রর সাহায্য না পাইলে সুধীন্দ্রর পক্ষে খাড়া থাকা হয়তো সম্ভব হইত না!

পিতার মৃত্যুর পর রাজার সন্তান যেদিন পাওয়া-ধনে বঞ্চিত হইয়া ভিখারীর মত আসিয়া দেবেন্দ্রর কাছে মূর্চ্ছাহতের মত পড়িয়াছিল, সেদিন দেবেন্দ্রর সান্ত্বনাই ছিল তাহার একমাত্র অবলম্বন!

জীবনবাবুরা যখন কলিকাতায় আসিলেন, সুধীন্দ্র আর দেবেন্দ্র তখন এক জায়গায় থাকিত। জীবনবাবুদের সহিত সুধীন্দ্রর তেমন ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয় নাই। তাঁহারা দেশে গেলে অনেক দিন পরে হঠাৎ সুধীন্দ্র একদিন সোনার কথা ভাবিয়া অস্থির হইয়া উঠিল। নিজের দুর্ব্বলতাকে শত ধিক্কার দিয়া মনকে শাসাইল—আমি তার কেহ নই! সে আমার কেহ নয়—কেহ নয়!

মন তবু ঘুরিয়া ঘুরিয়া সেই মুখখানিকেই সকল চিন্তার কেন্দ্র করিতে চায়। স্বপনে-জাগরণে সব সময়ে মন বলে, সোনা—সোনা! সুধীন্দ্র বিহ্বলের মত ভগবানকে ডাকে, বলে—দাও, বল দাও! সোনা কেউ নয়!...তাকে ভুলিয়ে দাও!

দেবেন্দ্রকে কাছাকাছি পাইয়া তাহার দুটী হাত ধরিয়া কহিল—"দেবী, কি অশান্তি আমি দিনরাত ভোগ করছি ভাই, এ থেকে নিস্তার না পেলে আমি পাগল হয়ে যাবো!"

দেবেন্দ্র গভীর স্নেহে বন্ধুকে বুকে জড়াইয়া ধরিল। সুধীন্দ্র

উচ্ছ্বসিত আবেগে বলিল, "তার উপরোধ দু'পায়ে থেঁৎলে তাকে অপমান করে চলে এসেছি! আমাকে কাজ দে দেবো, কাজের মধ্যে আমাকে ডুবিয়ে দে, ভাই। নাহলে বাঁচবো না!"

দেবেন্দ্র ক'দিন পূর্ব্বে জীবনবাবুর চিঠি পাইয়াছিল—সেই চিঠির কথা ভাবিয়া দেবেন্দ্র আশ্বাস দিয়া কহিল,—"কাজ দেবো। তোর উপযুক্ত কাজ। তোর যেমন সাধ, চরকা চালিয়ে খদ্দর প্রচার করে দেশের কাজ করবি, তার ক্ষেত্র ঠিক আছে। কিন্তু ভাই, প্রথমে কিছু বেগ পেতে হবে হয়তো! যাঁর কাছে পাঠাবো ভাবছি, তিনি আমার আত্মীয়, প্রতিপালক—আমার জীবনদাতা। তোকে ছাড়া আর কাকেও সেখানে পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারবো না। তিনি বিদেশে থাকার ফলে নায়েব-গোমস্তারা নানা গোলমাল বাধিয়ে সব বরবাদ দেবার দাখিলে ফেলেছে। আগে তোকে সেই সব ঠিক করে নিজের হাতে নিয়ে, তারপর সুবিধামত চরকা-খদ্দরের কাজে লাগতে হবে! দু'চার দিন এখানে আগে মাথা ঠাণ্ডা কর—মনের এ অবস্থায় মাথায় কিছু আসবে না।"

সুধীন্দ্র কহিল—"গোলমালই আমি চাই, খুব হাঙ্গাম, খুব ঝঞ্ঝাট—এক মিনিট বিশ্রামের অবসর নয়! নিশ্বাস ফেলবার অবকাশ চাই না। তা'হলেই বাঁচবার আশা।"

"তাহলে আমার চিঠি নিয়ে যা। আমাকেও তিনি যেতে লিখেছেন, কিন্তু আমি বিষয়-কর্ম্মের কিছুই জানি না—সে বিষয়ে তুই-ই পোক্ত। তা ছাড়া আমার শ্বশুর-মশায়ের খুব

অসুখ। তাঁরা যেতে লিখেছেন। জীবনকাকা যে কাজের পরামর্শ করতে ডেকেছেন, তুই গেলেই সে কাজ হবে। আমার পরামর্শের কোনো দরকার হবে না। চিঠিতে আমি সব কথা লিখে দিলুম।”

তারপর সুধীন্দ্র গ্রামের স্টেশনে নামিয়া যখন জীবনবাবুর গৃহাভিমুখে চলিয়াছে, তখন ভাবে নাই যে, ভাগ্য কি অদ্ভুত রকমে তাহাকে সেখানে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া দিবে!

বৃদ্ধা দাসীকে ও অপর্ণাকে অতর্কিত বিপদে রক্ষা করিয়া তাহাদের সঙ্গে কুণ্ঠিত চরণে গিয়া সুধীন্দ্র যখন জীবনবাবুর সম্মুখে দাঁড়াইল, তখন তিনি ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। বৃদ্ধা দাসী হাউ হাউ করিয়া কহিল—“আজ আমাদের পুনর্জ্জন্ম গো বাবা। তুই দেবতা পেরাণদুটো বাঁচিয়েছে।”

স্পন্দিত বক্ষে পিতাকে দু হাতে জড়াইয়া অপর্ণা কহিল—“সত্যি বাবা! ভাগ্যে দেবুদা এঁকে পাঠিয়েছিলেন, নাহলে তোমাকে আর দেখতে পেতুম না।”

জীবনবাবু আর কিছু শুনিবার অপেক্ষা না করিয়াই তৎক্ষণাৎ দুহাতে সুধীন্দ্রর হাত ধরিয়া শ্রদ্ধায় সমাদরে ঘরে আসিয়া বসাইলেন। সুধীন্দ্র সঙ্কোচে মুখ তুলিতে পারিল না।

সব শুনিয়া বাহুল্য না করিয়া সংক্ষেপে তিনি বলিলেন, “আমার ছেলে নেই, আজ থেকে তুমি আমার ছেলের স্থান অধিকার করলে, বাবা!”

সুধীন্দ্র ঝাপ্‌শা চোখে হাত বাড়াইয়া তাঁহার পায়ের ধূলা লইল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

হঠাৎ হাত-টান পাড়ায় তখনই রবীন্দ্রর দেশে যাওয়ার সুবিধা হইল না। টাকা পাঠাইবার জন্য মহেশের হাতে গিরিশচন্দ্রের কাছে জোর হুকুমনামা পাঠাইল। কিন্তু বাল্যাবধি এই জমিদারীর সংস্রবে থাকিয়া গিরিশচন্দ্রের প্রভাব এমন অটুট যে, তাঁহাকে বাদ দিতে গেলে কুম্ভের মত সব একেবারে খালি হইয়া পড়িত! সেই জন্যই গিরিশচন্দ্রের আর কিছু হোক না হোক, মস্ত সহায়—লোক-বল। সোনার বাপের আমল হইতে তখনকার সেই ক্ষুদ্র তালুকের সঙ্গে যে সব কর্ম্মচারীর সংস্রব ছিল, সম্পত্তি-হস্তান্তরের সঙ্গে সঙ্গে হর-গোপালের বিশাল জমিদারীর কাজে গিরিশচন্দ্র তাহাদিগকে এবং তাহাদের আত্মীয়দের বাহাল করিয়া নিজের দুর্গ এমন সুরক্ষিত করিয়া লইয়াছেন যে, সহসা তাহার মধ্যে মাথা গলাইবে, এমন সাহস কাহারও ছিল না। নেশা ছুটিয়া গেলে রবীন্দ্রর যখন সে খেয়াল হইল, তখন সে মাথায় হাত দিয়া বসিল। মহেশ ঘোষ সেই সময়ে আসিয়া দাঁড়াইলেন—তাঁহার মুখখানা ঝুলের মত কালো।

রবীন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল—“টাকা আজও এলো না খুড়ো!”

"আসবে কি! হতভাগা চিঠি যা লিখেছে, সামনে পেলে তাকে ধরে জুতো পেটা করলেও রাগ যেতো না।" বলিয়া মহেশ ঘোষ নিজের রাগে নিজেই যেন ক্ষেপিয়া উঠিলেন!

রবীন্দ্রর বুক অজ্ঞাত আশঙ্কায় কাঁপিয়া উঠিল। মুখ পাংশু—ভয়ে ভয়ে সে প্রশ্ন করিল—"কেন? কি লিখেছেন?"

মহেশ ঘোষ বলিলেন—"তোমার কৈফিয়ৎ তলব করেছেন! লিখেছেন, তোমার দাদা এতকাল কলকাতার বাসায় থেকে লেখাপড়া শিখেছেন, তাঁকে মাসে মাসে খরচ যা পাঠানো হতো, তোমাকে তার চারগুণ বেশী পাঠানো হচ্ছে। তাতেও যদি না কুলোয় তো মাসিক যা বরাদ্দ আছে, তার বেশী এক কড়া তিনি দিতে পারবেন না।"

"বটে!" রবীন্দ্র চম্‌কাইয়া উঠিল।

মহেশ ঘোষ শ্লেষের সুরে কহিলেন—"চম্‌কাচ্ছো কি! শোনো—আরও আছে—সরকারী তহবিলে টাকা নেই, প্রজারা খাজনা বন্ধ করেছে। বিষয় কার, তার হেস্তনেস্ত না হওয়া পর্য্যন্ত প্রজারা কেউ খাজনা দেবে না। সব ধর্ম্মঘট করেছে। পূজোর ত'বিলেও টানাটানি—বাজে খরচ আমোদ-আহ্লাদ নাচ-গান সব বন্ধ। নমঃ-নমঃ করে কোনো মতে পূজা হবে! কাঙ্গালী-ভোজনের ব্যবস্থা! ছোটবাবুর সখ হলে তিনি নিজের খরচে সে ব্যবস্থা করতে পারেন, তাতে কেউ বাধা দেবে না।"

রবীন্দ্রর মুখ চকিতে যেন কাগজের মত সাদা! সে স্তম্ভিত হইয়া রহিল।

মহেশ ঘোষ কহিলেন—"অমন করে হাল ছেড়ে বসে ভাবলে চলবে না! নৌকো যখন ঘূর্ণিতে পড়েছে, তখন শক্ত করে হাল ধরতে হবে। জানো তো—খুঁটোর জোরে মেড়া লড়ে! তুমি শক্ত না হলে আমি লড়বো কিসের জোরে, বাবা?"

রবীন্দ্রর মনে হইতেছিল, গিয়া এখনি গিরিশচন্দ্রের পায়ে ধরিয়া মার্জ্জনা চায়! পিতার পরম স্নেহের পাত্র এবং বিশ্বাস-ভাজন হইয়া এতকাল ধরিয়া বুকের রক্ত দিয়া যিনি তাহাদের সর্ব্বস্ব রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, আবাল্য তাহাকে পুত্রাধিক স্নেহে ভরাইয়া মানুষ করিতেছেন, তিনি যখন অমন চিঠি লিখিয়াছেন, তখন বুঝি ডুবিবার আর বিলম্ব নাই! সেই সুহৃদের প্রতি অজ্ঞাতে কাহার প্ররোচনায় কতবার অন্যায় করিয়াছে, তা সে মনে করিতে পারিল না! তাহার মাথা ঘুরিল।

তাহার মনোভাব অনুমান করিয়া মহেশ ঘোষ কহিলেন—"ছি ছি, তুমি লেখাপড়া শিখেছো বাবাজি,—আমাদের মত মুর্খ নও! কিসের ভয়?"

রবীন্দ্র হঠাৎ বলিল—"পারবেন?"

"পারবো না? হাঃ—হাঃ—হাঃ! তুমি হাসালে বাবাজি!" বলিয়া মহেশ ঘোষ নিজের বুকে হাত ঠুকিয়া কহিলেন—"আমার নাম মহেশ ঘোষ—তোমাদের ওখানেই নাহয় নতুন বাসিন্দে। হালিসহরে আমার নামে সকলে থরহরি কাঁপে! জিজ্ঞাসা করো তোমার ছোটঠাকুমাকে! ও কত বড় গিরিশ

মিত্তির, আমিও বুঝে নেবো!…হুঁ হুঁ বাবা, সম্পত্তি ফাঁকি দেওয়া নয়! ঘুঘু দেখেছেন, ফাঁদ দেখেননি এখনো!"

বলিয়া মুখের ও চোখের এমন ভঙ্গি করিলেন যে রবীন্দ্রর ভয়-ভাবনা অনেকখানি উবিয়া গেল! সঙ্গে সঙ্গে বিবেকের যেটুকু সাড়া হৃদয়ে জাগিয়া ছিল, তাহাও লঘু হইয়া আসিল। ইতস্ততঃ করিয়া সে কহিল—"তা'হলে খুড়ো, এখন ব্যবস্থা—"

"দাঁড়াও! আগে বেশ করে বুঝে দেখি!" বলিয়া খানিকক্ষণ কি ভাবিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার বাবা উইলে বড়বাবুকে শুধু মাসিক ভাতার বরাদ্দ করে দেন, তোমাকেই সব সম্পত্তির মালিক করে গেছেন?"

"শুনতে তো পাই। কিন্তু সে উইল আমি দেখিনি।"

"উইলের প্রোবেট নেওয়া হয়নি?"

"ঠিক জানি না। সম্ভব, হয়েছে।"

"না হয়, ক্ষতি নেই। তাহলেও অর্দ্ধেক তো তোমার হবেই। কিন্তু তার মতলবখানা বোঝা গেছে। দেখে নিচ্ছি, কত-বড় ধড়িবাজ! আগে একবার গিয়ে বসতে দাও—তারপর দেখে নিয়ো, কি কাণ্ড করে তুলি!" বলিয়া মহেশ ঘোষ আবার কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া প্রশ্ন করিলেন—"আচ্ছা, পুরানো আমলাদের বিশ্বাস হয়? তারা তোমার দিকে আসবে কিনা বলতে পারো?"

এবার রবীন্দ্র বড় রকম ভুল করিল। গিরিশচন্দ্রের প্রভাব তাহাদের সম্পত্তির উপর কতখানি, তাহা জানিলেও

মহেশ ঘোষের আশ্বাস-বাণীতে ভরসা পাইয়া সে কেমন একটু উল্‌টা ইঙ্গিত করিতে ছাড়িল না। বাল্যাবধি কর্ম্মচারীরা তাহাকে ভালোবাসিয়া কত যত্ন-আদর করে, তা যেমন মনে জাগিয়া উঠিল, তেমনি ইহাও মনে পড়িল, তাহারা গিরিশ-চন্দ্রের ভয়ে সর্ব্বদা তটস্থ হইয়া থাকে! সুতরাং তাহারা তাঁহার পক্ষ লইবে কি? সে বলিল—"খুব! খুব। জোর করে বলতে পারি। বাবার আমলের আমলা—কেউ বেইমানী করবে না।"

"তবে আর কি, বাজীমাৎ।" বলিয়া মহেশ ঘোষ বাম-হাতের তালুতে ডান হাতের পিছন দিক ঠুকিয়া সোৎসাহে বলিয়া উঠিলেন—"তবে আর যায় কোথা? জেলার বড় বড় উকিল এই হাতের মুঠোয়! তাছাড়া কলকাতার দু'জন নামজাদা ব্যারিষ্টার···হুঁ, হুঁ বাবা।"

রবীন্দ্রর বুক কাঁপিয়া উঠিল! ভয়ে ভয়ে সে জিজ্ঞাসা করিল—"মামলা করতে হবে?"

"হবে না? নাহলে কি পেট ফুঁড়ে সম্পত্তি টেনে বার করতে পারবো? তা তোমায় কোনো ঝক্কি পোয়াতে হবে না, বাবা! কোনো ভাবনা নেই—তুমি নিশ্চিন্ত থাকো! আমি আছি···হেঁ হেঁ···তাহলে এখন আসি।"

"কত খরচ হবে···আন্দাজ?"

"তা হাইকোর্ট অবধি যেতে হয় যদি, দশ পনেরো হাজার।"

রবীন্দ্র ম্লান মুখে নিরাশ কণ্ঠে কহিল—"এত টাকা কোথায় পাবো?"

একগাল হাসিয়া আত্মীয়তা জানাইয়া মহেশ ঘোষ কহিলেন,—"আরে টাকার ভাবনা কি, বাবাজি? তোমার এই খুড়ো বেঁচে থাকতে তোমার গায়ে আঁচড়টুকু লাগতে দেবো না। তুমি খালি গ্যাঁট হয়ে বসে ছাখো।" বলিয়া মহেশ কার্য্যান্তরে প্রস্থান করিলেন।

রবীন্দ্রর মনটা আবার খোলশা হইয়া নিত্যকর্ম্মে ঝুঁকিয়া পড়িল। কিন্তু ভবিষ্যতের কথা ছাড়িয়া দিলেও উপস্থিত ক্ষেত্রে টাকার কত প্রয়োজন, তা যখন খেয়াল হইল, তখন সন্ধ্যার পরে—নেশার আমেজ একটু একটু করিয়া জমিয়া আসিতেছে—গৌরী স্বহস্তে প্রস্তুত কাটলেট আনিয়া তাহার মুখে গুঁজিয়া দিয়া প্রশ্ন করিল,—কৈ, আজ যে স্যাকরাকে সন্ধ্যার পর আমার চুড়ি আর নেকলেস আনতে বলেছিলে—সে এলো না তো! লোক পাঠাও।"

রবীন্দ্র চম্‌কাইয়া উঠিল! মনে পড়িল, গিরিশচন্দ্রকে পূজার সওগাতের বাবদ অবিলম্বে দুই হাজার টাকা পাঠাইতে লিখিয়া দিয়াছে সেই কারণে! শুধু ওই গহনা নয়, সখের খাতিরে আরও এমন বহু দেনা করিয়া বসিয়া আছে! দু-চার দিনের মধ্যে টাকার কিনারা করিতে না পারিলে লোকের কাছে মুখ দেখাইবার উপায় থাকিবে না! সঙ্গে সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের কথা মনে পড়িল—চোখের সামনে দিনের আলো নিবিয়া আসিল যেন! মাথাটা ঘুরিয়া উঠিল—চিন্তিতভাবে সহসা তাকিয়ায় ঠেশ দিয়া চিৎ হইয়া পড়িল। গৌরী বলিয়া উঠিল—"অসুখ করেছে নাকি? দেখি। তা চুলোয় যাক আমার গহনা!

তুমি ভালো থাকলে ঢের হবে। ও গয়না-ফয়নার কথা ভেবো না, ঘুমোবার চেষ্টা করো। আমি বাতাস করছি।”

জড়িত কণ্ঠে রবীন্দ্র কহিল—“না, না। ও কিছু নয়, এখনি সেরে যাবে, তুমি একবার খুড়োকে ডেকে দাও।”

মুখ ফিরাইয়া ঈষৎ হাসিয়া গৌরী চলিয়া গেল···প্রস্থানের একটু পরে মহেশ ঘোষ আসিয়া কহিলেন—“শুনলাম, অসুখ করেছে? তা এত ভাবনা কিসের? কিচ্ছু ভেবো না তুমি।”

“ভাববো না! বলো কি খুড়ো? টাকা পাঠালো না। এখন এদিককার উপায়? রাত পোহালেই—”

মুখখানা গম্ভীর করিয়া মহেশ ঘোষ কহিলেন—তাই তো বাবা, এদিককার কথা তো ভাবিনি! উপস্থিত তো দু’তিন হাজারের কম রক্ষা পাওয়া মুস্কিল! তারা পাঠাবে না, আগে জানলেও যাহোক করে—”

মহেশ ঘোষের ভাব দেখিয়া রবীন্দ্রর ভয় বাড়িল। আকুল-ভাবে তাঁহার দুই হাত ধরিয়া সে বলিয়া উঠিল—“রক্ষা করো খুড়ো, এ যাত্রা মান বাঁচাও। তুমি ছাড়া আর কেউ নেই।”

“তাই তো বাবা, শক্ত কথা! শেষ মুহূর্ত্তে হঠাৎ—”

“যেমন করে হোক, টাকা চাই-ই! না হলে আমার গলা টিপে মেরে রেখে যাও, সে সহ্য হবে, কিন্তু অপমান আমি সইতে পারবো না।”

চিন্তার ভাণ করিয়া মহেশ কহিলেন, “দেখি ভেবে··· কিনারা হবেই। যতক্ষণ তোমার খুড়ো আছে, ততক্ষণ

কাতর হয়ো না !" বলিয়া গৌরীকে ডাকিয়া তিনি বাহির হইয়া গেলেন।

তারপর যখন ফিরিয়া আসিলেন, তখন রবীন্দ্রর পূর্ব্বভাব অনেকটা বদলাইয়া আসিয়াছে। দু-একবার মাথা তুলিয়া সে জড়িত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "কিছু করে এলে, খুড়ো ?"

"এক রকম! এখন তোমার বরাত !" বলিয়া যাহা জানাইলেন, তাহার স্থূল-মর্ম্ম—হ্যাণ্ডনোটে দশ হাজার লিখিয়া পাঁচ হাজার পাওয়া যাইতে পারে। সুদের কথাকথি নাই—যাহা ইচ্ছা দিলে চলিবে ! কিন্তু সেই হ্যাণ্ডনোটে তারিখ দিতে হইবে দু'বছর আগেকার। এ সর্ত্ত ছাড়া শেষ-মুহূর্ত্তে টাকা পাইবার আর কোনো উপায় নাই।

রবীন্দ্র কি চিন্তা করিতে লাগিল। জিজ্ঞাসা করিল—"টাকা দেবে কবে ?"

"যখন চাও। কাল বলো কালই। মস্ত-বড় ধনী। নগদ টাকার আণ্ডিল। সম্প্রতি শ্বশুর মারা গিয়ে লাখ-লাখ টাকা পেয়েছে আর দু'খানা বাড়ী।"

"কিন্তু প্রকাশ হবে না তো ?"

"আরে রাম বলো ! এঁর তো ব্যবসা নয়, মেডিকেল কলেজ থেকে ডাক্তার হয়ে বেরিয়েছেন। নাম দেবেন ঘোষ। আমার সঙ্গে আগে থেকে জানাশুনা ছিল, তাই নেহাৎ পীড়াপীড়ি করে ধরায় রাজী হয়েছে, না'হলে এমন মানী লোক কি উঞ্ছবৃত্তি করতে চায় ?"

এত টাকা এখনি পাওয়া যাইবে ! রবীন্দ্র উত্তেজিত হইয়া

উঠিল। স্বহস্তে এক-ডোজ ঢালিয়া চুমুক দিয়াই সে কহিল—"খুড়ো, এতক্ষণে বাঁচালে বাবা! দাও, একটু পায়ের ধুলো দাও!"

পরের দিন যখন অতি সহজে একখানা কাগজে সই দিয়া রবীন্দ্র স্বর্গ পাওয়ার মতই নোটের তাড়া হাতে পাইল, তখন কষ্টে হাসি চাপিয়া দেবেন্দ্র কহিল—"দরকারের সময় আর কোথাও না গিয়ে দয়া করে আমার কাছেই আসবেন।"

মহানন্দে সেকৃহ্যাণ্ড করিয়া রবীন্দ্র কহিল—"নিশ্চয়··· নিশ্চয়। আপনাকে কি বলবো দেবেনবাবু,···আজ থেকে জানবেন, আপনি আমার পরম বন্ধু।"



পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

—"জবাব এলো ?"

"ও চিঠির জবাব আসবে ভাবো ?" বলিয়া গিরিশচন্দ্র একটু হাসিলেন, হাসিয়া কহিলেন—"এবারে কর্ত্তা নিজে নতুন বন্দোবস্ত করবেন—তার বিলি-বন্দেজ করছেন আর কি! ঝোপ বুঝে কোপটি ঠিক মারা হয়েছে—একেবারে হাড়ে গিয়ে লেগেছে! এমন বাঁদর!"

"ছেলে-মানুষ! ওর উপর রাগ করা মিথ্যা। আর বুদ্ধিই বা কতটুকু। অপরে যা বোঝাচ্ছে—"

গিরিশচন্দ্র উত্তেজিত স্বরে বলিলেন—"হুঁ! কিন্তু সাপ নিয়ে খেলা!" বলিয়া কথা শেষ না করিয়াই তিনি অন্য কথা পাড়িলেন, বলিলেন—"এ ধাক্কা আগে সামলাক তো।"

"আমিও তাই চাই! ও এমন অধঃপাতে যাবে, তা আমি প্রাণ থাকতে সইতে পারবো না।" বলিতে বলিতে সোনার গলা ভারী হইয়া দু'চোখ ছলছল করিয়া উঠিল। গিরিশচন্দ্র কহিলেন—"না, সে ভয় নেই! সেই জন্যই তলে তলে খবর নিয়ে চারিদিক বেঁধে চাল চেলেছি।"—তারপর একটু চিন্তা করিয়া পুনরায় কহিলেন—"এখন মনে হয় সোনা, গোড়া থেকে অতখানি বিশ্বাস না করে যদি ওর উপর ভালো রকম নজর রাখতুম, তা'হলে আজ এমন হতো না।"

সোনা কহিল—"আগে থাকতে নজর রাখলে এই

হালিসহরের দল দুটি তাকে নষ্ট করতে পারতো না ঠিক, কিন্তু সুধী-দাকে ফিরিয়ে আনবার আশা ? আমার এখন একটি কথা কেবলি মনে হয়,—সুধী-দাকে কোনো মতে ফিরিয়ে এনে, তাঁর গচ্ছিত ধন তাঁর হাতে তুলে দিয়ে আমরা এ দায় থেকে খালাশ হই !"

গিরিশচন্দ্র বুঝিলেন, বুঝিয়া তিনি বলিলেন—"এখন বুঝে দেখ, তিনি ভুল করে যাননি। কত বড় বুদ্ধিমান—কত দূরদর্শী ছিলেন, তাই ভেবে অবাক হয়ে যাই।" বলিয়া চোখের একটা ইঙ্গিত করিতেই সোনা কৃত্রিম কোপে বলিয়া উঠিল—"যাও··· ফের এই কথা !"

গিরিশচন্দ্র থামিলেন না, বলিলেন,—"সত্যি সোনা, এ আমার মস্ত গর্ব্ব, সুধীর জোর কপাল যে, কর্ত্তা তোমাকে আমার হাতে দিয়ে গিয়েছিলেন। নাহলে প্রথমে যত কষ্টই পেয়ে থাকো—আজ যদি মেয়ে গছিয়ে মহেশ ঘোষ আমাকে হাতের মুঠোয় পেতো, তাহলে তোমরা দুজনে এক হয়েও আমাদের গ্রাস থেকে এ সম্পত্তি রক্ষা করতে পারতে না! মনে প্রথমটা খুব আঘাত পেয়েছিলে তুমি। কিন্তু গোড়ায় কষ্ট না করলে পরিণাম সুখের হয় না।"

সোনার মুখে হঠাৎ কে যেন এক আঁজলা অন্ধকার মাখাইয়া দিয়াছে ! লজ্জানম্র অস্ফুট স্বরে সে কহিল—"খুব সত্যি কথা। এখন বুঝতে পারছি।"

গিরিশচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন—"টাকা তা'হলে এখন কি করবে ?"

"সুধী-দার সন্ধানের কতদূর কি হলো ?"

"সৎকার্য্যে ভগবানের সাহায্য পাওয়া যায়, তার প্রমাণ এই দেবেনবাবু। তিনি আমাদের এত হিতাকাঙ্ক্ষী, আগে তা জানতুম না। আমার তো কলকাতায় যাওয়া-আসা নেই, তাই পরিচয় হয়নি। তিনি যখন নিজে থেকে কৌশল করে এ ব্যাপারে হাত দেছেন, তখন ভগবানের দয়া ছাড়া আর কি বলবো !"

সোনা জিজ্ঞাসা করিল, "তিনি কোনো খবর জানেন ?"

"জানলেও, মনে হয়, ইচ্ছা করে ভাঙ্গেননি। পীড়াপীড়ি করে চিঠি লিখেছিলুম, তাতে খুব জটিল জবাব ! লিখেছেন,—এত ব্যস্ত হবেন না ! একবার দেখা হলে গোপনে সব বলবো।"

"তুমি তাঁর কাছে গেলে না কেন ?"

মৃদু হাসিয়া গিরিশচন্দ্র জবাব দিলেন, "চালে ভুল করো না সোনা। চারিদিক থেকে ঘর না বেঁধে কিস্তি দিলে ফশ্ করে বেরিয়ে যাবে ! রবির যখন খরচ বন্ধ করেছি, সেই সঙ্গে ওর পূজোব আমোদ একেবারে নাকচ করে দিয়েছি, তখন এসে একটা হৈ চৈ করবেই ! এখন সব দিকে নজর রেখে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে দেখি, আমল পায় কি করে !" বলিয়া গিরিশচন্দ্র চলিয়া গেলেন।···

সপ্তাহ যাইতে না যাইতে হঠাৎ একদিন বৈকালে বাড়ীর সুমুখ দিয়া গ্রামান্তরে যাইতে তিনি চম্‌কাইয়া উঠিলেন। তিন-চার জন লোক বাড়ীখানা পরিষ্কার করিতে লাগিয়া

গিয়াছে! আশ্চর্য্য হইয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোরা এখানে কি করছিস্?"

একজন বৃদ্ধ প্রণাম করিয়া কহিল—"কেন, দিদিঠান হুকুম দেছে, আজকের মধ্যে সব ফিট্ফাট্ করে দিতে হবে, আপনারা কালকে বিকালে আসবে, তার মধ্যে এমন করে দেবো যে, কে বলবে, এতদিন বাস করোনি।"

গিরিশচন্দ্র আর কিছু না বলিয়া প্রস্থান করিলেন; ফিরিয়া আসিয়া সোনাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি এ কি করেছো—বাড়ী সাফ করতে লোক লাগিয়েছো?"

"হ্যাঁ, সময় কই? পরশু সকালে রবি আসবে, তার আগে আমরা নিজেদের বাড়ীতে যেতে চাই।"

"সে কি! কোথায় ভেবে রেখেছি, তাকে আমল দেবো না মোটে!"

"তা হয় না, তাতে আমাদের কাজ উদ্ধারে দেরী হবে। তা ছাড়া চোখের আড়ালে সে যাই করুক, সামনে এসে দাঁড়ালে সব গুলিয়ে যাবে! তার উপর যত চটপট হয়—ততই ভালো।" বলিয়া সোনা ঈষৎ হাসিল, কিন্তু গিরিশচন্দ্র কি ভাবিয়া কোনো কথা বলিলেন না।

মনে অনেকখানি আশা লইয়া রবীন্দ্র যখন গৃহে আসিয়া পৌঁছিল, তখন সব কথা শুনিয়া শুধু নিরাশ হইল এমন নয়, ব্যথাও পাইল। একবার ইচ্ছা হইল, কৃত অপরাধের জন্য মার্জ্জনা চাহিয়া আবার তাহাদিগকে ফিরাইয়া আনে! কিন্তু হারাধন আসিয়া উৎফুল্ল কণ্ঠে কহিল—"এসো ভায়া, আজ

আমার বৈঠকখানায় তোমার নেমন্তন্ন। মাল-পত্র তুলতে বলে দিচ্ছি!”

ঈষৎ বিরক্ত হইয়া রবীন্দ্র কহিল—“থামো—আগে এদিক্‌কার সব—”

—“আহা, সে সব তো হবেই···তুমি যখন সশরীরে এসে হাজির হয়েছো! সারারাত ট্রেণে ধকল গেছে! আর্শিতে মুখ-খানা দেখলেই বুঝবে—আঁতের কষ্ট মুখে ফুটে উঠেছে! শরীরটা সামলে নিয়ে খাড়া হও, নাহলে কাজ-কর্ম্ম করবে কে?”

উদ্বেগে, আশঙ্কায়, ক্রোধে, লজ্জায়—সারারাত্রি ট্রেণে জাগিয়া ভাবিতে ভাবিতে আসিয়া রবীন্দ্রর শরীর অবসন্ন। সে আপত্তি করিল না, হারাধনের সঙ্গে তাহার বৈঠকখানায় উপস্থিত হইল এবং ঘণ্টাখানেকের মধ্যে যখন দেহের ও মনের অবস্থা ফিরিল, তখন হারাধন নানা কথায় তাহাকে উত্তেজিত করিয়া তুলিয়া শেষে বলিল, “আর দুদিন পরেই ষষ্ঠী। বাইজীদের নিয়ে সন্ধ্যার গাড়ীতে মহেশ ঠাকুরদাও এসে হাজির হবেন। কিন্তু এদিকে কিছু জোগাড় হয়নি তো!”

“কেন হয়নি? করোনি কেন?”

“তোমাদের কর্ত্তা কিছু করতে দিয়েছে কি? তারা নিজের ইচ্ছায় নিজে থেকে বাড়ী ছেড়ে চলে গেছে! ভালোই! না'হলে হাঙ্গাম করতে হতো!”

কথাটা রবীন্দ্ররও মনে পড়িল। সে বলিল, “রামবাবুকে বোলাও।”

অমনি লোক ছুটিল। গ্লাসটা তাহার হাতে তুলিয়া

দিয়া হারাধন কহিল, "খেয়ে নাও, এসময়ে ইস্পিরিট দরকার।"

সেটুকু পান করিয়া রবীন্দ্র কহিল, "এ-সব ওদিকে সরিয়ে রাখো। বাবার আমলের আমলা!"

"হাঃ—হাঃ—হাঃ—ড্যাম্ কেয়ার! ও দুর্ব্বলতা করলে ওরা পেয়ে বসবে। ওদের বুঝতে দাও—হ্যাঁ বাবা, বাঘের বাচ্চা বাঘই হয়।"

এবারেও রবীন্দ্র ভুল করিয়া বসিল। রামবাবু আসিয়া ব্যাপার দেখিয়া ঘৃণায়, বিরক্তিতে, লজ্জায়, সঙ্কোচে যখন মুখ নীচু করিয়া দাঁড়াইলেন, তখন রবীন্দ্র জড়িতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—"হাম্ কৈফিয়ৎ মাঙ্‌তা—পূজোর জোগাড় হয়নি কেন? এতদিন সবাই ঘুমোচ্ছিলে নাকি?"

বিরক্তিভরে রামবাবু জবাব দিলেন—"কে বল্‌লে, হয়নি? সব হয়েছে।"

খপ্ করিয়া হারাধন বলিয়া উঠিল—"আরে তা নয়, তা নয়—চুলোয় যাক এরা! বাবু বলচেন, এই নাচ-গান—বুঝলে?"

রামবাবুর মনে যত ঘৃণা হইল—ক্রোধ হইল তাহার অধিক—নিজেকে কোনমতে সংযত করিয়া তিনি বলিলেন—"আজ্ঞে, ম্যানেজারবাবুর হুকুম ছিল না।"

"ম্যানেজারবাবু মালিক, না, তোমাদের বাবা?" বলিয়া হারাধন লাফাইয়া উঠিতেই রবীন্দ্র হাত তুলিয়া তাহাকে নিষেধ করিল; রামবাবুকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, "যান্—এ—খ—নি—জোগাড় করুন।"

রামবাবু কহিলেন, "তহবিলে টাকা নেই অত।"

হারাধন গর্জ্জিয়া উঠিল—"সে নিকেশে তোমার দরকার? হুকুম পেয়েছো, তামিল করো।"

কিন্তু রামবাবু তবু ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। দেখিয়া রবীন্দ্র কহিল—'কত টাকা লাগবে?"

রামবাবু কহিলেন,—"ঠিক বলতে পারবো না। ম্যানেজার-বাবুকে জিজ্ঞাসা করে দেখি।" বলিয়া তিনি স্থান ত্যাগ করিয়া গেলেন।

কিন্তু হারাধনের কৌশলে এবং রবীন্দ্রর কতক অনিচ্ছায় যখন ম্যানেজারবাবুর ডাক পড়িল, তখন রবীন্দ্রর অবস্থা ভালো নয়। বিরক্তি-ভরে সে বলিল—"কি ছেলেমানুষী করলে হারু-দা! এইবেলা ও সব বোতল-টোতল সরিয়ে ফেলো শীগ্‌গির।"

"বয়ে গেছে! কেন? কিসের ভয়? ওঃ ভা-রী—"

"ফের বকছো? যা বলছি, করো এখনি। আহাম্মক কোথাকার।"

ধমক খাইয়া হারাধন আদেশ না মানিয়া পারিল না। কিন্তু তার মনের সব আক্রোশ নিঃশেষে পড়িল গিরিশচন্দ্রের উপর!

তিনি আসিবামাত্র হারাধন বলিয়া উঠিল "এই যে পালের গোদা!" বলিয়াই মাতাল-কণ্ঠে সুর ধরিল—"ডাকাতেরি শিরোমণি তুমি যাদু গুণমণি—"

কিন্তু শিক্ষা পাইল সেই মুহূর্ত্তেই। গিরিশচন্দ্র মুখে কিছু না বলিয়া যে-পেয়াদা তাঁহাকে ডাকিয়া আনিয়া বাহিরে

দাঁড়াইয়াছিল, তাহাকে ইসারা করিতেই পলকে সে ভিতরে আসিয়া হারুর ঘাড় ধরিয়া বিড়াল-ছানার মত বাহিরে লইয়া গিয়া ছাড়িয়া দিল। রবীন্দ্র নমস্কার করিবার জন্য বারম্বার উঠিবার চেষ্টা করিয়াও পারিল না। গিরিশচন্দ্র গভীর স্বরে কহিলেন—"থাক, আর কষ্ট করে প্রণাম করতে হবে না। কিন্তু ছোটবাবুর এ সময়ে এমন অবস্থায় আমাকে তলব করার উদ্দেশ্য ?"

লজ্জায় ভয়ে রবীন্দ্র যেন মাটীর সঙ্গে মিশিয়া গেল! জড়িত-কণ্ঠে সে বলিল, "আজ্ঞে—"

"যাক, আর কথায় দরকার নেই! এখনি এই হতভাগা-গুলোকে তুমি দূর করে দেবে কি ?"

"আজ্ঞে,—তা—তা—কেমন—ক—রে—"

গিরিশচন্দ্র বেশ শান্ত সহজ কণ্ঠে কহিলেন—"বেশ, সেই ভালো। ধর্ম্মের কাছে···ভগবানের কাছে···যত কর্ত্তব্য, যে-দায়িত্ব ছিল আমার, তা থেকে আজ মুক্তি নিলুম! এবার থেকে তুমি নিজে সব করো।"

বলিয়াই কোমর হইতে একতাড়া চাবি ফেলিয়া দিয়া নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেলেন। হারাধন সঙ্গে সঙ্গে লাফাইয়া ঘরে ঢুকিল, এবং লাফাইতে লাফাইতে বলিল—"বেঁচে থাকো, বাবা আত্মারাম! এখনি আমি পাঁচ পয়সার বাতাসা আনিয়ে হরির লুট দেবো।"

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

বৈকালে গ্রামে বেড়াইতে বাহির হইয়া অপর্ণা যখন বামুন-পাড়ায় গিয়া ঢুকিল, তখন বৃদ্ধা পাঠক-গৃহিণী ঘরের দাওয়ায় বসিয়া পৈতা তৈরীর জন্য টেকোয় সূতা কাটিতেছে। বাড়ীর সুমুখে ভাঙ্গা বেড়ার ফাঁকে সে দৃশ্য চোখে পড়িতে অপর্ণা কৌতূহলী হইয়া ভিতরে গিয়া বলিল—"দেখি, দেখি। বাঃ! বেশ সরু সূতো হচ্ছে তো! আচ্ছা ঠানদি, চরকায় কাটতে পারো না?"

"কেন পারবো না ভাই? আগে যখন খুব বেশী দরকার হতো, তখন আর টেকো ধরতুম না, আমরা তিন জায়ে তিনটে চরকা নিয়ে বসতুম। এখন তার দরকার কৈ? আর তূলোই বা অত পাবো কোথা? ঘরের পিছনে গোটাচারেক পুরোনো কাপাশ গাছ আছে, তাতে তূলো যা পাই, তাই কুড়িয়ে কুড়িয়ে রাখি, আর অল্প-স্বল্প টেকোতে কাটি।"

অপর্ণার কৌতূহল বাড়িল। সে নিজে গিয়া কাপাশের গাছ দেখিয়া নানা কথা জানিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"আচ্ছা, এ সূতোয় কাপড় বোনা যায় না?"

পাঠক-গৃহিণী কহিল, "কেন যাবে না দিদি? এ-বা কি সূতো! এখন চোখ গেছে—হাত কাঁপে—তাই পারি না। নাহলে চরকায় এমন সূতো কাটতে পারতুম—কোথায় লাগে তার কাছে আজকালকার কাপড়ের সূতো! আজকাল কেউ তা

চায় না। চাইলে তূলোর চাষ করে ঘরে ঘরে সবাই যদি চরকা কাটে, তা'হলে কি আর অন্নবস্ত্রের অভাব থাকে, ভাই? ঐ মুকুন্দ তাঁতিরা এখন খেতে পায় না! আগে দিন-রাত ওরা চারখানা তাঁত চালাতো! আর গুমোর ছিল কত!"

বলিয়া বৃদ্ধা প্রাচীনকালের এমন সুখ-সমৃদ্ধির চিত্র আঁকিতে লাগিল যে, অপর্ণা মুগ্ধ হইয়া গেল। গৃহে ফিরিয়া একেবারে সুধীন্দ্রর কাছে গিয়া সে বলিল—"আজ এক নতুন জিনিষ দেখে এসেছি। এ গাঁয়ে কাপাশের চাষ হতো—এখনো পাঠকদের বাড়ীতে গাছ আছে, সেই তূলোয় বুড়ী কি চমৎকার সূতো কেটেছে! দেখতে যাবেন?"

সুধীন্দ্র বলিল, "নিশ্চয় যাবো। ক'জনে চরকা কাটে?"

"চরকা নয়! সে এক মজা! ঠিক যেন লাট্টুর মত। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সূতো কাটে, পাঠক-বুড়ীর কেউ নেই—সে ঐ সূতোয় পৈতে তুলে বিক্রী করে। সে বলে, গাঁয়ের অনেক বাড়ীর মেয়েরা চরকা কাটতো। এখন সূতো পায় না—কাটা বন্ধ। এখন যদি কাপাশের চাষ করে চরকা ধরানো যায়, তাহলে—"

"আমিও ক'দিন তাই ভাবছি, অপর্ণা! এদিককার সব হাঙ্গাম তো মিটিয়ে ফেলেছি! সব বন্দোবস্ত হয়ে গেছে। আর কোনো গোলমাল নেই। কাজেই আমার কাজের ঝক্কিও আর নেই। ভাবছিলুম, কি এখন করি?"

"আমি কত কি করতে চেয়েছিলুম তো! আপনি খালি জমিদারীর কাজে মাথা তোলবার ফুরসৎ পাননি বলে এতদিন বলিনি। এখন আসুন, দু'জনে"...বলিয়াই অপর্ণা সলজ্জভাবে

মুখ নত করিল! ঠিক সেই সময়ে জীবনবাবু আসিয়া প্রশ্ন করিলেন—

—"হ্যাঁ মা, তোমরা তাঁতিদের কাকেও কাপড় বোন্‌বার কথা বলেছিলে ?"

"বলেছিলুম, বাবা! আমরা যে সূতো কেটেছি, তাই দিয়ে কাপড় কেমন হয় দেখবার জন্য পার্ব্বতীর বাবাকে বুন্‌তে বলেছিলুম। এনেছে না কি ?"

"না—একখানা বিছানার চাদর বুনে এনেছে শুধু! তা মন্দ হয়নি। সূতো কম পড়েছে বলে আরো সূতো নিতে এসেছে।"

সুধীন্দ্র বলিল, "আমার তো সূতো আর কাটা নেই। ভুলে গিয়েছি!"

অপর্ণা হাসিয়া উঠিল—"বাঃ—বেশ হয়েছে! খুব জব্দ! আপনি হেরে গেলেন! আমার কত সূতো হয়েছে, দেখবেন ?" বলিয়া অনেক সূতো আনিয়া পিতার হাতে দিয়া কহিল—"এই দেখ বাবা, আমি জিতেছি।"

হাসিয়া জীবনবাবু বলিলেন—"সুধী কি এ আট-দশ মাসের মধ্যে সময় পেয়েছে রে ? পেলে তুই হেরে যেতিস্।"

"তবেই হয়েছে! উনি আমায় শিখিয়েছেন বটে, কিন্তু ওঁর সূতোর চেয়ে আমার সূতো কত সরু আর ভালো হয়! চলো পার্ব্বতীর বাপ কি বলে শুনবে।"

সেই প্রথম দিন হইতেই সুধীন্দ্রর উপর জীবনবাবুর স্নেহের

টান পড়িয়াছে। তার উপরে সে যখন বৎসরাবধি অক্লান্ত পরিশ্রমে দিবারাত্র খাটিয়া বিষয়-সম্পত্তির সব গোলমাল মিটাইয়া তালুকের শ্রী ফিরাইয়া দিল, তখন গ্রামের সকলে যেমন ভক্তি-শ্রদ্ধায় অবনত হইয়া তাহার সুখ্যাতিতে দিক্ মাতাইয়া তুলিল, তেমনি এই অদ্ভুতকর্ম্মা যুবকের দক্ষতা দেখিয়া জীবনবাবুও তাহাকে আর কর্ম্মচারী বলিয়া ভাবিতে পারিলেন না। তাঁহার মনে এক গোপন আকাঙ্ক্ষা জাগিল। তিনি সুধীন্দ্রর সকল পরিচয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানিবার জন্য কাজের অছিলায় নিজে একদিন কলিকাতায় গিয়া দেবেন্দ্রর সঙ্গে দেখা করিলেন।

দেবেন্দ্র তখন মৃত শ্বশুরের বিষয়-সম্পত্তি পাইয়া জাঁকিয়া বসিয়াছে। পরম সমাদরে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া সুধীন্দ্রর সম্বন্ধে যাহা বলিল, শুনিয়া জীবনবাবু বলিলেন—“আমারও প্রথম থেকে এমনি মনে হয়েছিল দেবু। ছোকরার চেহারা, শিক্ষা, ভদ্রতা, শিষ্টতা আর ব্যবহার দেখে ও যে সামান্য গৃহস্থ-ঘরের ছেলে নয়, তা আমার মনে হয়েছিল। কিন্তু এত লেখাপড়া শিখেছে, তা ঠাওর করতে পারিনি!”

—“কেন কাকাবাবু, আপনার তালুকের নায়েব-গোমস্তারা যা করে রেখেছিল, তাতে কি সাধারণ-লেখাপড়া-জানা মানুষ হলে খেই পেতো! সুধী বলেই ওদের ভিতরকার সব গলদ টেনে বার করে বিষয়টাকে রক্ষা করতে পেরেছে।”

“সে কথা ঠিক, বাবা! এতকাল ওকালতি করে চুল পাকালুম, তবু শয়তানগুলোর প্যাঁচোয়া বুদ্ধির মধ্যে ঢু'কতে

পারিনি। কিন্তু অনেক রাত্রে উঠে লুকিয়ে লুকিয়ে ও আমার আইনের বইগুলো পড়তো। আমার সেই বুড়ো বটু বেয়ারা দু'তিন দিন দেখেছিল। সে আমাকে বলেছিল। কিন্তু তখন বিশ্বাস হয়নি।"

"তা ছাড়া ছেলেবেলা থেকেই দেখে দেখে শিখে আসছে তো!"

জীবনবাবু গম্ভীরভাবে বলিলেন—"তা তো বটে! সিংহ-শাবক কখনো তার প্রকৃতিগত অধিকার ছাড়তে পারে?"

দেবেন্দ্র কহিল—"একটা কথা মনে রাখবেন—ওকে জানতে দেবেন না যে, আপনি তার পরিচয় জানেন! ঘুণাক্ষরে যদি টের পায়, তা'হলে ও আর একটি দিন—"

"কিন্তু কেন, বাবা? এর মধ্যে এমন কি রহস্য?" প্রশ্নটা জীবনবাবু একটু কিন্তু-ভাবেই করিলেন।

তাহা বুঝিয়া দেবেন্দ্র কহিল—"রহস্য একটু আছে কাকাবাবু! এখন আমি তার কাছে সত্যে বদ্ধ, প্রকাশ করতে পারছি না, পরে সব জানতে পারবেন। জানলে ওর উপর আপনার শ্রদ্ধা আরো বাড়বে। এখন শুধু জেনে রাখুন, যাকে আমি আপনার কাছে পাঠিয়েছি, তার নাড়ী-নক্ষত্র বুঝে পরিচয় না জানলে পাঠাতে ভরসা করতুম না কখনো! কর্ম্মচারী হিসাবে আপনার বিষয়-সম্পত্তি দেখবার জন্য দেশে বিশ্বাসী প্রবীণ লোক ঢের মিলতো কাকাবাবু! তার জন্য আমার বন্ধু সুধীকে পাঠাতুম না।"

এই ইঙ্গিতটুকু বুঝিয়া জীবনবাবু কহিলেন—"আমাকে মস্ত

দুর্ভাবনার হাত থেকে বাঁচালে, বাবা! চিরকাল বিদেশে পড়ে থেকে দেশের সঙ্গে সম্পর্ক উঠেই গেছে। তাই অপর্ণার জন্য ভারী ভাবিত হয়েছিলুম! তোমাকে যেমন নিজের ছেলের মত পালন করেছি, তুমিও তেমনি আজ আমার ছেলের কাজ করলে!"

বাধা দিয়া দেবেন্দ্র কহিল, "আপনি বিদেশে থাকলেও অপুর বিয়ের ভাবনা আমি না ভেবে থাকতে পারিনি!...কিন্তু এখন, এ নিয়ে বেশী ব্যস্ত হবেন না। যথাসময়ে আমি আপনাকে সব কথা জানাবো।"

জীবনবাবু কহিলেন, "কিন্তু অপুর বয়স তেরো ছাড়িয়ে গেছে দেবেন।"

দেবেন্দ্র বলিল "গেলই বা! ও ভাবনা আপনি করবেন না। ওর ভার আমার রইলো!"

জীবনবাবু আশ্বস্ত হইয়াই গৃহে ফিরিলেন। কাহাকেও বিন্দু-বিসর্গ না জানাইলেও তাঁহার স্নেহ সুধীন্দ্রর উপর এখন এমনভাবে প্রকাশ হইতে লাগিল যে, তাহাতে শুধু পাড়ায় কানা-ঘুষা পড়িয়া গেল এমন নয়, সুধীন্দ্র নিজেকে আর ইহাদের নিঃসম্পর্কিত মনে করিতে পারিল না। সেদিন অপর্ণার উৎসাহে যখন কার্পাস চাষ প্রভৃতি প্রচলনের চেষ্টা করিতে লাগিল, তখন এক বৃদ্ধ চাষা কহিল—"তা বড়বাবু, এবার আমরা কিছু কিছু নতুন জমিতে চাষ করে দেখি—কি রকম হয়! আগেকার যে-সব জমিতে তূলোর চাষ হতো, সে সব জমি আর খালি নেই—এখন আবার নতুন করে নিতে হবে।"

"তোমরা সকলেই চেষ্টা করো। অন্ততঃ আমাদের এখানকার লোকদের মতও—"

"তা কি হবে দিদিঠান্? অত তূলো কি জন্মাবে?"

"না জন্মায়, তখন অন্য তালুকে কাপাস করবো।" বলিয়া অপর্ণা সুধীন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি বলেন—অন্য তালুক পাওয়া যাবে না?"

খুশী হইয়া সুধীন্দ্র কহিল, "কেন যাবে না? দেবীকে চিঠি লিখে তার সন্ধান করতে বলবো।"

"তা'হলে আজই লিখে দিন—দেবু-দা অত জমিদারী পেয়েছে, সে নিশ্চয় দিতে পারবে।"

অপর্ণা জোর করিয়া সেই দিনই দেবেন্দ্রকে চিঠি লিখাইল।



সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

পূজার ক'দিন খুব হৈ হৈ করিয়া আমোদ-প্রমোদের উত্তাল তরঙ্গে মাতোয়ারা হইয়া কাটাইয়া দিবার পর রামবাবু আসিয়া যখন হিসাব দেখাইয়া, দেনা মিটাইবার জন্য টাকার কথা পাড়িলেন, তখন রবীন্দ্রর চৈতন্য হইল। রামবাবু কহিলেন—"উপস্থিত হপ্তা-খানেকের মধ্যে এই খুচরোগুলো না মিটোলে মান থাকে না। তারপরে যা, সে তো আছেই।"

হিসাবের ফর্দ্দ দেখিয়াই রবীন্দ্র বিস্ময়ভরে বলিয়া উঠিল—"সে কি! এ যে তিন হাজারের ধাক্কা! এত খরচ হলো?"

"আজ্ঞে, আমরা হুকুমের চাকর—যখন যেমন হুকুম হয়েছে—"

"থাক্, থাক্, খুড়োমশাই কোথা?"

"তিনি কাল জেলায় গেছেন, উকিলবাবুর বাড়ী—এখনো ফেরেননি।"

ঈষৎ কুণ্ঠিত হইয়া রবীন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল—"গিরিশ-দার খবর জানেন?"

"আজ্ঞে, তাঁরা দু'জনেই সেই কাঙালী-ভোজনের পরের দিন গঙ্গা নাইতে গেছেন—এখানে নেই।"

রবীন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল—"কাঙালী-ভোজন হয়েছিল?"

"সে এক রকম না হওয়াই! এ তরফ থেকে আমরা তো কোনো সাহায্য করিনি। তাই ওঁরা নিজেরা যা পেরেছেন—"

হারাধন হঠাৎ ঘরে ঢুকিল, রাগে উত্তপ্ত হইয়া কহিল—. “তাই তো ছোটলোক ব্যাটাদের আস্পর্দ্ধা ভারী বেড়ে গেছে! হাটে-বাটে আর মুখ দেখানো যায় না, ভাই! শালারা বলে বেড়াচ্ছে, বাবুরা নবাবি দেখিয়ে শুঁড়ি আর মাতালের হাট বসিয়ে সব ফুঁকে দিলে! কিন্তু পূজোর তিন দিন কুকুর-বেড়ালটা পর্য্যন্ত এঁটো-কাঁটা চোখে দেখতে পেলে না! এখন দেনা মেটাবার সময়ে সাউখুড়ি! দেখে নেবো সকলকে!”

রবীন্দ্রর মুখে হাসি নাই—ইঙ্গিতে রামবাবুকে বিদায় দিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল—“কি হলো?”

“হবে আবার কি! যখন নিজে গেছি, তখন কি ছেড়ে আসি? শালা কি দিতে চায়? আমি'ও নাছোড়বান্দা।”

“আট দশটা টাকাও ছাড়তে চায় না?”

“আট-দশটা টাকা কি বলছো—তিনশো টাকার উপর তার পাওনা হয়ে গেছে!” বলিয়া হারাধন বাহিরের দিকে চাহিল, চাহিয়া কাহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, “নিয়ে আয়!”

রবীন্দ্র আকাশ হইতে পড়িল, তাহার মুখ হইতে আপনা হইতে কথা বাহির হইল “কি সর্ব্বনাশ!”

দেশী দুটো মদের বোতল রাখিয়া লোকটা চলিয়া গেলে রবীন্দ্র বলিল—“কলকাতা থেকে দুটো কেস এনেছিলুম যে!”

“ফুঃ!” বলিয়া মুখের বিকৃত ভঙ্গী করিয়া হারাধন কহিল— “সে তো ষষ্ঠীর রাত্রেই সাবাড়! জেলা থেকে যে সব বাবু এসেছিলেন, তাঁরা এক একটি পাঁড়! ভাগ্যিস্ দামু শুঁড়ি ছিল, তাই রক্ষা হয়েছে—নাহলে দাঁড়িয়ে অপমান হতো। নাও—এসো।”

রবীন্দ্র কিন্তু বহু চেষ্টা করিয়াও মনকে চাঙ্গা করিতে পারিল না। মহেশ ঘোষ আসিয়া কহিলেন, "যাক, কাম্ ফতে! উকিল-মোক্তারদের পূজোর ক'দিন. এখানে এনে, স্ফূর্ত্তিতে চুবিয়ে খুব কাজ সারা হয়েছে!—তাদের মুখে তোমার সুখ্যাতি ধরে না। সব আধা-কড়িতে কাজ করে দেবে। হ্যাঁ।"

তারপর টাকার কথা উঠিতেই রবীন্দ্র কহিল—"সে পরের কথা। উপস্থিত এক ফর্দ্দ ছ্যাখো। টাকা না পেলে অপমানের একশেষ।"

এ কথা বলিয়া রামবাবুর ফর্দ্দখানা সে তাহার হাতে দিল।

ফর্দ্দে চোখ বুলাইয়া মহেশ ঘোষ কহিলেন—"এ ছাড়াও তো এদিককার খুচরো-খাচ্রা বহুৎ আছে! নয় কি?" বলিয়া হারাধনের দিকে চাহিতেই, সে বলিয়া উঠিল—"সে তো তুমিও জানো ঠাকুর্দ্দা! দাম্র পাওনা হবে প্রায় সাড়ে তিনশো।"

"তা হবে বৈ-কি।" বলিয়া মহেশ ঘোষ রায় দিলেন—"সে বেচারা বিনা-বাক্যে তিন-চার দিন সমানে জুগিয়ে গেছে। তা' হলে দেখছি-আরো হাজার পাঁচেক!"

রবীন্দ্র বলিল—"হ্যাঁ, তাহ'লেই এদিকে সব পরিষ্কার হয়ে যাবে। তারপর ঝরঝরে হয়ে আসল-কাজে হাত।"

"তাহলে কালই চলো, দু-তিন দিনের জন্য একবার কলকাতা ঘুরে আসা যাক্।"

কিন্তু মহেশ ঘোষের কথায় কলিকাতায় গিয়া সেখান হইতে

ফিরিয়া আসিতে যখন দু' দিনের জায়গায় দু' সপ্তাহ কাটিয়া গেল—এবং দ্বিতীয়বার দশ হাজার লিখিয়া হাজার পাঁচেক পাইয়াও যখন অনেকের দেনা সম্পূর্ণ শোধ হইল না, তার উপর আরো কতকগুলা নূতন দেনা চাপিয়া বসিল, তখন একদিন হারাধন হঠাৎ কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত। রবীন্দ্রকে কহিল—"খুব আক্কেল তোমার ভায়া! নিজে এখানে এসে দিব্যি গা-ঢাকা দিয়ে আছো, আর ওদিকে যে টাকা পাঠালে, তাতে সব দেনা চুকলো না! অথচ আজ পাঠাই কাল পাঠাই করে টাকাও পাঠালে না! বাড়ীতে আমাদের টেঁকা ভার হয়েছে! রোজ দু'বেলা কত লোক তাগাদায় আসছে, তার ঠিকানা নেই! মান ইজ্জৎ আর কিছু রইলো না! এতদিন কোনো শালা বাড়ীর সামনে দিয়ে মাথা উঁচু করে যেতে পারেনি, আর এখন বাড়ী চড়াও হয়ে এসে যা-তা শুনিয়ে দিয়ে যাচ্ছে! তার উপর সেই দামু শালা—তার সে টাকা তোমার আগে পাঠানো উচিত ছিল! সে শালা পথে ঘাটে দেখলেই অপমান করে। হয় এর বিহিত করো, না হয় আমাদের আবার দেশে পাঠিয়ে দাও ভাই।"

সেদিন কলিকাতার বাসাতে রবীন্দ্রর জন-কতক বন্ধু নিমন্ত্রিত হইয়া আসিল! আসর খুব জাঁকিয়া উঠিল। কিন্তু এত আমোদ-আহ্লাদেও রবীন্দ্রর মনে শান্তি নাই।

পরদিন আবার যখন দেবেন্দ্রর কাছে গিয়া আর একদফা হ্যাণ্ডনোটের প্রস্তাব করিল, তখন দেবেন্দ্র কহিল—"সে কি

মশাই! এই যে সে দিন চার হাজার তিনশো টাকা নিয়ে গেলেন। আবার টাকা?"

রবীন্দ্র আমতা আমতা করিয়া মুখ নীচু করিল। হাসিয়া দেবেন্দ্র কহিল—"জানেন, সব সময়ে অত নগদ টাকা ঘরে থাকে না! একদিন আগে বললে রাখতে পারতুম, এখন তো সুবিধা হবে না।"

রবীন্দ্রর প্রাণ যেন উড়িয়া গেল! কাকুতি-মিনতি করিয়া সে বলিল, "মান বাঁচান দেবেনবাবু, আমাকে রক্ষা করুন! আপনাকে দিতেই হবে। যেখান থেকে হোক।"

মহেশ ঘোষ সায় দিয়া দেবেন্দ্রকে অনুনয়-বিনয় জুড়িয়া দিলেন। দেবেন্দ্র কহিল—"আপনি ভদ্রলোক—অত করে বলছেন। কিন্তু সত্যি বলছি রবিবাবু, আমার হাতে কিছু নেই! —দেখি, যদি মেয়েদের কাছে পাই!"

"দেখুন দয়া করে—লক্ষ্মীর ভাণ্ডার আপনার ঘরে!" বলিয়া মহেশ ঘোষ খোসামোদের ফোয়ারা ছুটাইয়া দিলেন।

কিন্তু ভিতর-বাড়ী হইতে দেবেন্দ্রনাথ ক্ষণকাল পরে ফিরিয়া আসিয়া মুখখানা গম্ভীর করিয়া কহিল—"আপনার বরাত খারাপ রবিবাবু—বাড়ীতে মেয়েদের কাছে দু' হাজারের বেশী নেই।"

হারাধনের অপমানের খোঁচা তখনো পর্য্যন্ত রবীন্দ্রর বুকে খচ্ খচ্ করিতেছে! সে বলিয়া উঠিল—"তাই দিন,—বড় দায়ে পড়ে এসেছি দেবেন বাবু!"

মুখখানা অতিরিক্ত গম্ভীর করিয়া দেবেন্দ্রনাথ কহিল—

"কিন্তু আমার প্রিন্সিপল্ জানেন তো—লিখতে হবে দশ হাজার আর তারিখ—"

"সে জানা আছে। দিন, কাগজ দিন।"

অতঃপর দশ হাজার লিখিয়া দু হাজার লইয়া রবীন্দ্র তখনকার মত নিশ্চিন্ত হইল। কিন্তু দেশে ফিরিয়া যখন হপ্তাখানেকের মধ্যে তাহা নিঃশেষ হইয়া গেল, তখন দেবেন্দ্রনাথের কাছে তাহার ঋণ জমিয়া ত্রিশ হাজারে উঠিয়াছে।

মহেশ ঘোষ দু'চারদিন পরে উকিল-বাড়ী ঘোরাঘুরি করিয়া আসিয়া কহিলেন—"এইবারে বিষয়-সম্পত্তি উদ্ধার করতে হয় বাবাজী! নাহলে সব গেল।"

রবীন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল—"উপস্থিত কত টাকা লাগবে? সেটা জোগাড় করে নামতে হবে তো! এদিকে আদায় বলতে এক পয়সাও নেই, জানেন তো?"

চোখ গরম করিয়া মহেশচন্দ্র কহিলেন—"এ সব সেই গিরশে বেটার কারসাজি! আগে নামি, তখন বুঝে নেবো। কিন্তু উপস্থিত অন্ততঃ হাজার-পাঁচেক হাতে না করে তো নামা চলে না। এসব মামলার কথায় কথায় খরচা। অথচ না করলে উপায় নেই! নাহলে এমন ভাবে আর ক'দিন চলবে?"

চিন্তা করিয়া রবীন্দ্র কহিল—"তুমি জোগাড়-যন্ত্র করতে লেগে যাও, খুড়ো! আমি দেবেনবাবুকে চিঠি লিখি। আগে থাকতে না জানিয়ে গেলে হয়তো সেবারের মত দশ হাজার লিখে দু'হাজার নিয়ে আসতে হবে!"

কিন্তু জল্পনা-কল্পনা জোগাড়-যন্ত্র করিতে যখন দিন কাটিয়া

গেল, অথচ টাকার জোগাড় হইল না, তখন একদিন রামবাবু আসিয়া কহিলেন—"একটা নিবেদন আছে···আপনি মাস-খানেক আগে জানাতে বলেছিলেন, তার এখনো প্রায় দু'মাস বাকী।"

রবীন্দ্র বিরক্ত হইয়া বলিল—"ও সব ভূমিকা ছেড়ে আসল কথা ভেঙ্গে বলুন।"

"আজ মাসের দশ দিন হয়ে গেল তহবিল একেবারে, খালি! ফাল্গুন মাস বাদে চোতের কিস্তি।"

রবীন্দ্রর মুখ অত্যন্ত ঘোরালো হইয়া উঠিল। রামবাবু ধীরে ধীরে সরিয়া পড়িলেন।

মহেশ ঘোষ কহিলেন—"এ কিস্তির টাকাটা আগে জোগাড় করে ফেলো বাবাজী।"

"সে কি খুড়ো, আমি জোগাড় করবো কোত্থেকে?" বলিয়া রবীন্দ্র আশ্চর্য্য হইয়া তাঁহার পানে চাহিল।

হতাশ কণ্ঠে খুড়ো বলিলেন—"তা বটে। কিন্তু তুমি না হলে—"

"আমি তো রয়েইছি! তবু উপায় করতে হবে তোমাকে।"

মহেশ ঘোষ বলিলেন, "আমার যা সাধ্য, করেছি, এবার আমার হাত-পা ভেঙ্গে গেছে বাবাজী! এই দেখো, দেবেন-বাবুর চিঠি।"

চিঠি পড়িয়া রবীন্দ্র একেবারে বজ্রাহতের মত মাথায় হাত দিয়া বসিল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

গঙ্গাস্নানে যাইবার প্রবল ইচ্ছার মধ্যে সোনার মনে আর কি উদ্দেশ্য নিহিত ছিল, তা অপরে না বুঝিলেও গিরিশচন্দ্রের বুঝিতে বাকী ছিল না। যাত্রার আয়োজন করিতে করিতে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"কত দিনের মত আয়োজন করে বেরুবো ?"

সোনা জবাব দিল—"তোমার চেয়ে আমি তার বেশী জানি নাকি ? যতদিন তোমার ইচ্ছা—তোমার চাড়েই যখন বেরুতে হচ্ছে !"

গিরিশচন্দ্র বলিলেন,—"বটে। আমার চাড়ে, না, তোমার চাড়ে ?"

সোনা গলায় আঁচল জড়াইয়া ঢিপ করিয়া একটা গড় করিয়া বলিল—"হ্যাঁগো বাবু, হ্যাঁ। আমার ভুল হয়েছে। আমার চাড়ে বা যার চাড়েই হোক্, তীর্থ দর্শন না করে ফিরবো না—তা কিন্তু বলে রাখছি।"

"তা'হলে চোত মাসের আগেই ফিরতে পারবো ! বাঙ্লায় তীর্থ খুব বেশী নেই। শেষ বড়-জোর গঙ্গাসাগর আর মাঘ-ফাল্গুনে নবদ্বীপ।"

সোনা কহিল,—"তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক ! ছেলেবেলা থেকে এত বয়স পর্য্যন্ত কখনো জেলার বাইরে

পা বাড়াইনি! এই ঘর-দোর বেড়ীর মত পা আঁকড়ে রেখেছে।"

গিরিশচন্দ্র একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "আমার অবস্থাও তোমার মত সোনা!—ছ্যাকড়া গাড়ীর ঘোড়া—গাড়ী-টানা ছেড়ে হাঁপিয়ে উঠেছি যেন!"

* * *

কালীঘাটে গঙ্গাস্নান এবং কালী-দর্শন সারিয়া সোনাকে লইয়া গিরিশচন্দ্র যেখানে উঠিলেন, সে বাড়ী দেখিয়া সোনা বলিল—"বাঃ! ভারী পরিষ্কার ঝরঝরে তো! ছোটখাট হলে কি, যেন ছবি!"

গিরিশচন্দ্র কহিলেন—"এখানে থাকতে কষ্ট হবে না?"

সোনা আশ্চর্য্য হইয়া তাঁহার মুখের পানে চাহিল। বলিল "বলো কি!"

হাসিয়া গিরিশচন্দ্র কহিলেন—"এখানে বসে দিব্যি গঙ্গাস্নান করো আর মাকে দর্শন করো।—সব তীর্থের মূল ওঁর চরণ—জানো তো?"

ভক্তিভরে কালীর উদ্দেশে সোনা নতি জানাইল। কিন্তু যখন মাসখানেকের বেশী কাটিয়া গেল, তখন বিরক্ত হইয়া সে কহিল—"এখানে এনে যদি এমন পিঁজ্‌রেতে আটক রাখবে, তাহলে রতনগড় কি অপরাধ করেছিল?"

এক গাল হাসিয়া গিরিশচন্দ্র বলিলেন—"গাছটা পুঁতে জল দিয়ে-দিয়ে বড় না করলে কি ফল ফলে? এত অধীর হলে চলবে না সোনা!" তারপর অপেক্ষাকৃত উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে

বলিলেন—"ফুল ধরেছে সোনা, ফল ফলতে দেরী নেই। ত্রিশ হাজার হয়ে গেছে!"

"বলো কি! এর মধ্যে ত্রিশ হাজার!"

"হবে না? তোমার সাধনার জোর কত! এখন যে-ক'দিন ওরা কলকাতার বাসা থেকে দেশে না যায়, সে ক'দিন আমাকে এই বাড়ীর মধ্যে কয়েদ থাকতে হবে।"

কিন্তু বেশী দিন তাঁহাকে কয়েদ থাকিতে হইল না, মাসখানেক না যাইতে যেদিন সন্ধ্যায় দেবেন্দ্রনাথের লোক আসিয়া খবর দিল, সেই দিনই গিরিশচন্দ্র তাহার সহিত বাহির হইয়া গেলেন। অনেক রাত্রে যখন বাসায় ফিরিলেন, তখন উৎকণ্ঠায় সোনা ছট্‌ফট্ করিতেছে। গিরিশচন্দ্র বাড়ীতে ঢুকিয়াই আনন্দের আতিশয্যে বলিয়া উঠিলেন—"কাল মায়ের বাড়ীতে গিয়ে পূজো দিয়ে আসি চলো সোনা, তার পর সোজা নবদ্বীপ।"

তারপর গিরিশচন্দ্র অনেক কথা বলিলেন—শুনিয়া সোনা শিহরিয়া উঠিল। জিজ্ঞাসা করিল, "নিলামে ওঠে যদি, তা হলে কর্ত্তাদের নাম ডুবে যাবে! দেবেনবাবুকে বললে সেটা বন্ধ হয় না?"

"তাঁকে কিছু বলতে হবে না সোনা! তিনি আমাদের চেয়ে ভায়ার কথা ঢের বেশী ভাবেন। এতদিন পরে সুধীর সে-বিয়ে ভেঙ্গে যাবার রহস্য টের পেলুম। ভায়া আমার ইচ্ছা করেই তাঁর বোঝা ঐ দেবেনবাবুর ঘাড়ে চাপিয়ে নিজে ঝাড়া হাত পা হয়ে আছেন!"

সোনার বুকখানা যেন প্রবল ঝড়ে দুলিয়া উঠিল! চোখে জল ছাপাইয়া আসিল!

* * * দেবেন্দ্রর চিঠি পাইয়া এবং মহেশ ঘোষের ভাব বুঝিয়া রবীন্দ্র যখন হতাশ হইয়া পড়িল, তখন তার মনে তীব্র অনুশোচনা! ছুটিয়া সে কলিকাতায় আসিল, এবং কালীঘাট প্রভৃতি গঙ্গাতীরবর্ত্তী স্থানে গিরিশচন্দ্র ও সোনার খোঁজ করিতে ত্রুটি রাখিল না। কিন্তু বহু সন্ধানেও তাঁহাদের পাইল না।

মহেশ ঘোষ এবারও অনাহূত ভাবে সঙ্গে আসিয়াছিলেন। তিনি কহিলেন—"তাদের আর খোঁজ করা কেন? তারা যখন সবদিকে তোমার হাত-পা বন্ধ করে দিয়ে ফেরার হয়েছে, তখন ওয়ারিণ বার না করলে কি ধরা যাবে? আমার কোনো দোষ নেই, বাবাজী। আগে থাকতেই—"

রবীন্দ্র বলিল—"না, দোষ কারো নয়—দোষ আমার বরাতের! যাক···কার কত মুরোদ, বোঝা গেছে! এখন একটু থামো!"

মুখখানা ঘোরালো করিলেও মহেশ ঘোষ কিন্তু রবীন্দ্রর সঙ্গ ছাড়িলেন না। ওদিকে গিরিশচন্দ্র ও সোনার অন্বেষণে হতাশ হইয়া রবীন্দ্র যখন নিরুপায় চিত্তে দেবেন্দ্রর কাছে আসিল, তখন মহেশ ঘোষ দেবেন্দ্রর দু'হাত ধরিয়া কাতরকণ্ঠে কহিলেন—"দোহাই বাবু, কূল দিয়ে পায়ে ঠেলবেন না! আপনি ছাড়া এখন আর কেউ নেই সহায়।"

দেবেন্দ্র বলিল—"বেশ, উনি যদি আমার কথা রাখেন,

তাহলে আমি ওঁকে বাঁচাবার চেষ্টা করবো। আচ্ছা, আপনারা একটু বসুন···রবিবাবু আমার সঙ্গে বাড়ীর ভিতর আসুন।”

মহেশ ঘোষ কিছু বলিবার পূর্ব্বেই রবীন্দ্রর হাত ধরিয়া দেবেন্দ্র তাহাকে এক রকম টানিয়া ভিতরে লইয়া গেল। দেখিয়া মহেশ ঘোষ একেবারে থ !

*   *

দিন পনেরো পরে নবদ্বীপে ধূলোটের উৎসব দেখিয়া গিরিশচন্দ্র কহিলেন—“আর কি ! বলেছিলুম না, নবদ্বীপে এসেছো কি অমনি ! স্থান-মাহাত্ম্য ! জগাই-মাধাই তরে গেল—আমরা কোন্ ছার ! নিলামের কত ভয় করেছিলে তো ! এই ছাখো, কাক-কোকিলে টের পেলেনা—কার্য্যসিদ্ধি ! ভায়া আমার এক চালে ভড়কে গিয়ে একেবারে কিস্তিমাৎ !···স্ব-ইচ্ছায় সুস্থ শরীরে দেনার টাকার বাবদ একেবারে তিন ভাগ সম্পত্তি দেবেনবাবুকে খোশ্-কবালা লিখে দেছে ! বাকী একভাগ—তাও জাঁকড়ে আছে। হাঃ—হাঃ—হাঃ --হাঃ—হাঃ !” বলিয়া হাসিতে হাসিতে চিঠিখানা তিনি সোনার হাতে দিলেন।

পড়িয়া সোনা বিস্ময়-ভরে বলিয়া উঠিল—“এ শুধু মায়ের দয়ায় ! নাহলে এত সহজে কাজ উদ্ধার হবে, স্বপ্নেও ভাবিনি।···রবি—”

“না দিয়ে করবে কি ? আমাদের ধরতে পারলে উপায় কিছু করে নিতে পারতো ! কিন্তু হাত-পা বাঁধা সাগরে ভাসছেন ! সব ব্যাপারের আম্‌মোক্তার-নামা আমার নামে। ও তখন নাবালক আর সুধী তখন বড়তরফ হয়েছিল কি না ! তাই

বাছাধন এখন ফাঁপরে পড়েছেন! তহবিল শূন্য—প্রজারা স্পষ্ট বলেছে, খাজনা দেবে না। এক পয়সা আদায় নেই! ধারও কেউ দেবে না! কার সম্পত্তি, তার ঠিক নেই।···আর দুটো দিন যদি আমরা লুকিয়ে থাকতে পারি, তাহলে কষ্ট হবে, কিন্তু এর চেয়ে আর বেশী কি? হাতে টাকা পড়লে তবে তো লম্ফ-ঝম্প! এখন বুঝেছেন, মামলার জন্য টাকার দরকার। নালিশ করা হবে কি! তার টাকা আজ পর্য্যন্ত জুটে উঠলো না! তার উপর সামনে চোত্ কিস্তি! মহেশ ঘোষ ব্যাটা এতখানি আঁচ করতে পারেনি, পারলে অন্য চাল চালতো। এখন মা জগদম্বার কৃপায় সুধীকে যদি এমনি সহজে পাই, তো ওই ময়শা ঘোষ আর হেরো, দু'বেটাকে আমি জেলে না পুরে ছাড়বো না। আমার নাম গিরিশ মিত্তির!"

খুশী হইয়া সোনা বলিল, "কালই আমরা ফিরে যাই, চলো। দেবেনবাবু যখন যেতে লিখেছেন, তখন দেরী করা ঠিক নয়।"

"সে কি, এমন ধূলোট, না দেখে যাবো? কত দেশ-দেশান্তর থেকে মানুষ আসছে!"

বাধা দিয়া সোনা কহিল—"ধূলোট আমার মাথায় থাকুন, আমি মায়ের কাছে বুক চিরে রক্ত দেবার মানসিক করে এসেছি। সে মানসিক শোধ করতে দেরী করা উচিত নয়। কালই চলো।"

* * * পরের দিন সোনাকে লইয়া গিরিশচন্দ্র

কলিকাতায় ফিরিলেন—একেবারে দেবেন্দ্রনাথের গৃহে। গাড়ীর শব্দে উপরের জানলা হইতে দেখিয়া দেবেন্দ্র তাড়াতাড়ি আসিয়া দু'জনকে সাদরে সম্বর্দ্ধনা করিল—"আজ সুপ্রভাত! তপস্যার জোরে ভাইয়ের বাড়ীতে আজ বোনের পায়ের ধূলো পড়লো!"

সোনাকে ভিতর-বাড়ীতে পৌঁছাইয়া আসিয়া গিরিশচন্দ্রকে কহিল—"পায়ের ধূলো দিন দাদা! আপনার আশীর্ব্বাদে সকল দিক শুভ মনে হচ্ছে। এখন তাঁর ইচ্ছা।"

গিরিশচন্দ্রকে লইয়া দেবেন্দ্র যখন বৈঠকখানায় প্রবেশ করিল, তখন জীবনবাবু সেখানে বসিয়া ছিলেন। দেবেন্দ্র বলিল—

"এঁর কথাই এতক্ষণ বলছিলুম কাকা! ইনি সুধীদের সর্ব্বেসর্ব্বা—গিরিশবাবু, সোনা-বোনও এসেছেন। তাঁকে ভিতরে পৌঁছে দিয়ে এসেছি।"

আবেগের আতিশয্যে জীবনবাবু গিরিশচন্দ্রকে দু'হাতে জড়াইয়া ধরিলেন।



উনবিংশ পরিচ্ছেদ

মুকুন্দপুরে প্রাচীন কাল হইতেই কার্ত্তিক সংক্রান্তিতে একটা জাঁকালো রকমের মেলা বসিত। কিন্তু গ্রামের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে সে মেলা লোপ পাইতে চলিয়াছে। সেবারে মেলা দেখিয়া অপর্ণা সুধীন্দ্রকে বলিয়াছিল—"আচ্ছা, আমরা চেষ্টা করে একটা খদ্দর-প্রদর্শনী খুলে কি দেশের এই মেলাকে আবার জাঁকিয়ে তুলতে পারি না?"

সুধীন্দ্র জবাব দিয়াছিল—"এবার গেল, আসছে বছর দেখা যাবে। খুব সম্ভব এ থেকে জমিদারীর একটা আয়ও হতে পারে।"

তারপর কাজের ঝঞ্ঝাটে সুধীন্দ্র সে-কথা এক রকম ভুলিয়া গিয়াছিল। কিন্তু অপর্ণা যখন পূজার পরই সে-কথা মনে করাইয়া দিল, তখন সুধীন্দ্রর কাজের ঝঞ্ঝাট অনেকখানি কমিয়াছে। তখন হইতেই সে এমন উঠিয়া পড়িয়া লাগিল যে, অপর্ণার উৎসাহ দশগুণ বাড়িল। সুধীন্দ্রর সঙ্গে ছায়ার মত সে ফিরিতে লাগিল। তাহাকে নিষেধ করিয়া সুধীন্দ্র কহিল—"তোমার এ রকম করে আমার সঙ্গে দিন-রাত হিমে-রোদে টো-টো করে ঘুরে বেড়ালে চলবে না।"

অপর্ণা নিরুৎসাহ হইল না—বলিল, "আমি একলাটি ঘরে বসে কি করবো, শুনি?"

"কেন, চরকা কাটো—পড়ো—"

"না, সে আপনি না থাকলে একলা ভালো লাগে না।"

"অসুখ হবে—তখন আমায় চালাবে কে? বলিয়া সুধীন্দ্র হাসিল।

প্রদীপ্ত উৎসাহে অপর্ণা জবাব দিল—"একলা থাকলেই বরং অসুখ করবে, আপনার সঙ্গে থাকলে কক্ষনো অসুখ হবে না। তাছাড়া আপনার যদি অসুখ হয়, তখন কি হবে? আপনি আমায় বারণ করবেন না—আমার মনে কষ্ট হয়।" বলিয়া সে মুখ নামাইল।

ঈষৎ হাসিয়া সুধীন্দ্র তাহাকে আদর করিল—"বোকা মেয়ে!"

এই নাছোড়বান্দা মেয়েটির পাল্লায় পড়িয়া সুধীন্দ্রর মনের বড় মেঘখানা যে একটু একটু করিয়া লঘু হইয়া, দিনে দিনে সরিয়া যাইতেছিল, তা সে নিজে বুঝিতে পারে নাই।

অপর্ণার কথাই ফলিল। তাহার অসুখ করিল না—অসুখ করিল সুধীন্দ্রর।

দিন-রাত পরিশ্রম—মেলাটাকে এক রকম দাঁড় করাইয়া দিয়া সেই যে গিয়া সে বিছানায় শুইল, পরের দিন সকালে আর উঠিবার সামর্থ্য নাই!

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বসিবার ঘরে সুধীন্দ্রর জন্য অপেক্ষা করিয়াও যখন সে আসিল না, তখন অপর্ণা চিন্তান্বিত হইয়া

খানেক ভাবিয়া ভেজানো দরজা ঠেলিয়া ঘরের মধ্যে আসিয়াই সে চমকাইয়া উঠিল—সুধীন্দ্র অসুস্থ!

মুখ রাঙা হইয়া ফুলিয়া উঠিয়াছে! স্খলিত কণ্ঠে সুধীন্দ্র বলিল—"অপর্ণা! ওঃ, আমার খুব জ্বর! সর্ব্বাঙ্গে বেদনা! মাথা যেন খসে যাচ্ছে।"

অপর্ণার প্রাণ উড়িয়া গেল! তাহার মুখের পানে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে অপর্ণার চোখ জলে ভরিয়া উঠিল।

সুধীন্দ্র কহিল—"তুমি যাও। এ ঘরে এসো না। বোধ হয় ইনফ্লুয়েঞ্জা। ছোঁয়াচে রোগ।"

পশ্চিমে থাকিয়া, ইনফ্লুয়েঞ্জার নামে অপর্ণার কেমন আতঙ্ক হয়।

সে পিতার কাছে আসিয়া খবর দিল। শুনিয়া জীবনবাবু শশব্যস্তে আসিয়া সুধীন্দ্রর বিছানায় বসিয়া বলিলেন—"ইস্—তাইতো! মুখ যে ভয়ানক থম্‌থম্ করছে! এক রাত্রেই এমন!"

অপর্ণার বুকের মধ্যে কে যেন হাতুড়ি পিটিতেছে! বড় একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সে বলিল—"কি হবে বাবা? আমার ভারী ভয় করছে।"

"ভয় কি মা! জ্বর হয়েছে, সেরে যাবে। আমি এখনি ডাক্তারকে আনতে পাঠাচ্ছি।"

"পাড়াগেঁয়ে ডাক্তার পারবে না বাবা! তুমি বরং দেবু-দাকে টেলিগ্রাম করে দাও।"

মেয়ের কথা জীবনবাবু ঠেলিতে পারিলেন না। ভয়ের

কারণ না থাকিলেও আপাততঃ স্থানীয় ডাক্তার আনাইয়া দেবেন্দ্রকে আসিবার জন্য ষ্টেশন হইতে টেলিগ্রাম করিয়া দিলেন। অপর্ণা গিয়া সেই যে সুধীন্দ্রর কাছে বসিল, কেহ তাহাকে সরাইতে পারিল না।

যথাসময়ে দেবেন্দ্রনাথ আসিয়া পৌঁছিল। তাহার চিকিৎসা, সেই সঙ্গে অপর্ণার সেবা-পরিচর্য্যা! অপর্ণা যেন বিশ্ব-সংসার ভুলিয়া গিয়াছে! ঘড়ি ধরিয়া টেম্পারেচার দেখা, চার্টে জ্বরের তাপমাত্রা লেখা, স্পঞ্জ করানো, পথ্য খাওয়ানো, মাথায় আইস্-ব্যাগ ধরা—সব কাজে এমন পটুতা···জীবনবাবু দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন! অপর্ণা এত শিখিল কি করিয়া?

দেবেন্দ্র কহিল—"ভগবানের ইচ্ছা কাকা, ওষুধের চেয়ে সেবাতেই এ সব অসুখ সারে। আমার ওষুধে যে কাজ হবে —অপুর সেবায় তার চেয়ে ঢের বেশী ফল পাবো।"

থাকিয়া থাকিয়া সুধীন্দ্রর কেমন আচ্ছন্ন ভাব! তন্দ্রার ঘোরে অতীতের কত কথা বকিতে থাকে! ভয়ে অপর্ণা ভাঙ্গিয়া পড়ে যেন! তার দু'চোখ ছাপাইয়া জলের ধারা ঝরে।

হাসিয়া দেবেন্দ্র আশ্বাস দেয় "কাঁদছিস্ কি পাগলি! কোনো ভয় নেই! আমি তো কতবার করে দেখছি! রোগটা বাঁকা পথ ধরেনি তো! সারতে সময় লাগবে, এই যা!"

চৌদ্দ দিন পরে সকালের দিকে জ্বর ছাড়িল। সুধীন্দ্র ঘুমাইতেছিল, জীবনবাবু আসিয়া অপর্ণাকে কহিলেন— "ভালো আছে। জ্বর গেছে। খেটে খেটে তোমারও

শরীর অর্দ্ধেক হয়ে গেল, মা! এখন তুমি একটু বিশ্রাম করোগে।"

ঈষৎ লজ্জিত হইয়া অপর্ণা ঘাড় নীচু করিল—কোনো কথা কহিল না। মেয়ের অন্তরের গোপন সাধটুকু জীবনবাবু এক নিমেষে উপলব্ধি করিলেন, তাই তিনি আর কথা বাড়াইতে চাহিলেন না, ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন।

মাঝ-রাত্রে ঘুম ভাঙ্গিয়া সুধীন্দ্র ঘুমের ঘোরে আপনা-আপনি বলিয়া উঠিল—"এসো কোথায় তুমি! এসো, এসো, আমি একলা, আমার বড় কষ্ট হচ্ছে! আমাকে একলা রেখে চলে যেয়ো না! আমার কেউ নেই···এসো!"

অপর্ণা তাহার শয্যাপ্রান্তে আড় হইয়া শুইয়াছিল, তাড়াতাড়ি মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া, গভীর স্নেহে মমতার স্বরে কহিল—"এই যে আমি···দিন-রাত তোমার কাছে আছি, তোমায় ছেড়ে কোথাও তো যাইনি।"

সুধীন্দ্রর চমক ভাঙ্গিল! জ্ঞান হইলে কপালের উপর উষ্ণ নিশ্বাসের স্পর্শে চমকিত হইয়া চাহিয়াই লজ্জায় সে যেন মরিয়া গেল! তখন আকুল আগ্রহে অপর্ণার মুখখানা স্পর্শ করিবার জন্যই যেন তাহার মুখের উপরে অবনত হইয়া গিয়াছে!

সুধীন্দ্র আরামে চোখ বুজিল, আবেগ-কম্পিত ক্ষীণ কণ্ঠে কহিল—"তেষ্টা—জল দাও—অপর্ণা!"

"এত রাত্তিরে জল খায় না। এই বেদানার রসটুকু খাও।" অপর্ণা নিপুণ হস্তে একটু একটু করিয়া বেদানার রস খাওয়াইয়া দিল।

সেইদিন হইতেই সুধীন্দ্র সারিয়া উঠিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বশ্রী ফিরিয়া অপর্ণাও আবার তেমনি চঞ্চলা হাস্যমুখী হইয়া উঠিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া জীবনবাবুর আনন্দের সীমা নাই। দেবেন্দ্রনাথকে সব খবর জানাইয়া এক দীর্ঘ পত্র লিখিলেন।

দিন পনেরো পরে সে পত্রের জবাব আসিল দেবেন্দ্রর নিকট হইতে। এক সঙ্গে দুখানি চিঠি আসিল। সুধীন্দ্র তখন বেশ সারিয়া উঠিয়াছে!

নিজের নামের চিঠিখানি পড়িয়া জীবনবাবু উল্লসিত হইলেন। কিন্তু সেভাব দমন করিয়া দ্বিতীয় চিঠিখানি স্বহস্তে দিবার জন্য যখন অপর্ণার কাছে চলিলেন, তখন সুধীন্দ্রর সামনে মুখোমুখি বসিয়া অপর্ণা কাগজ পড়িতেছে···সেই চিরদিনের সাধ-বাসনার কথা। জীবনবাবু বলিলেন—"এবার দিন কতক একটু হাওয়া বদল করলে সুধীর শরীর বেশ সুস্থ সবল হয়ে উঠবে। কি বলো মা?"

অপর্ণা জবাব দিবার পূর্ব্বেই সঙ্কুচিতভাবে সুধীন্দ্র কহিল—"তার দরকার হবে না। আমি বেশ সেরে উঠেছি।"

অপর্ণা বলিল—"না বাবা, ওঁর কথা শুনো না। উনি নিজের দিকে মোটে চান না। তুমি সেই ব্যবস্থা করে দাও। কিছুদিন হাওয়া বদলানো দরকার।"

জীবনবাবু বলিলেন—"আমাকে আর সে ব্যবস্থা করতে হবে না মা! দেবুই তা করেছে। যাবার জন্য চিঠি লিখেছে··· পড়ে দেখ।"

বাপের হাত হইতে চিঠি লইয়া পড়িতে পড়িতে অপর্ণা উল্লাস-ভরে বলিয়া উঠিল—"বাঃ, খুব মজা তো! দেবু-দা আমাদের জন্য খুব ভালো একটা তালুক কিনে ফেলেছে! সেখানে আবার খুব ভালো তুলোর চাষ হয়!"

"শুধু তাই নয় মা, সেখানকার প্রজারা নাকি কাপাস চাষ করবার কথা শুনে মেতে উঠেছে,—তোদের পেলে তারা মাথায় তুলে নেবে।"

অপর্ণা বলিল— "কালই চলো বাবা, আমার দেরী সইছে না!"

সুধীন্দ্র হাসিল। হাসিয়া জীবনবাবু বলিলেন—"কালই যাবো, কিন্তু সুধীকে একবার কেষ্টনগরে একটু কাজ সেরে তারপর যেতে হবে। নাহলে একটা সম্পত্তি নিলাম হয়ে যাবার দাখিল। আমরা দু'জনে গিয়ে কলকাতায় দেবুর বাড়ীতে থাকবো, তারপর সুধী কেষ্টনগর থেকে ফিরে এলে একসঙ্গে সকলে বেরুনো যাবে।"

সেই ব্যবস্থাই হইল। গৃহ হইতে তিনজনেই যাত্রা করিলেন। সুধীন্দ্র কৃষ্ণনগরে গেল, আর অপর্ণাকে লইয়া জীবনবাবু কলিকাতায় দেবেন্দ্রর গৃহে আসিলেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ

সোনারা কলিকাতায় দেবেন্দ্রনাথের গৃহেই আছে। দুদিনে সোনার সঙ্গে দেবেন্দ্রর পত্নী ও অপর্ণার এমন দুশ্ছেদ্য সখীত্বের বন্ধন হইয়াছে যে, কাহারও কাছে কাহারও মনের কথা একটুও অজ্ঞাত নাই। দেবেন্দ্রর পত্নী রমা সোনাকে বলিল—"কুড়িয়ে-পাওয়া অমূল্য মণির মত তোমাকে যখন পেয়েছি দিদি, তখন তুমি আমাদের ভুলো না যেন! ভগবানের দান বলে চিরকাল আমরা তোমায় মাথায় করে রাখবো।"

সঙ্কোচ-ভরে সোনা কহিল—"আমার মায়ের পেটের ভাই বোন নেই। তোমরা তার বাড়া। তোমাদের প্রেমের হাটে এসে যে মূল খুইয়ে বিকিয়ে গেলুম ভাই! আর কি আমাকে তোমাদের কাছ-ছাড়া করে কেউ রাখতে পারবে?"

অপর্ণা জিজ্ঞাসা করিল—"আচ্ছা, তা'হলে সব চেয়ে বেশী লাভ কে করলে, দিদি?"

"তুই বুঝতে পারছিস্‌নে?" বলিয়া সোনা মধুর হাসিতে সুধা ছড়াইয়া অপর্ণাকে বুকে চাপিয়া ধরিল, তারপর কচি মেয়ের মত তাহার গাল-মুখ চুম্বনে ভরাইয়া আদর করিয়া কহিল—"আমাদের সকলকার হৃদয়-সাগর ছেঁচে সাত রাজার ধন মাণিক তুলে নিয়ে যে গলায় পরে আছিস, ভাই!"

"ঠিক কথা দিদি!" বলিয়া দেবেন্দ্রর পত্নী হাসিয়া সায়

দিল। দিয়া বলিল—"কিন্তু আমাদের দু'জনের লাভ ওর চেয়ে এক-বিন্দু কম নয়।"

অপর্ণা নিজেকে সোনার বাহুপাশ হইতে মুক্ত করিয়া দেবেন্দ্রের পত্নীর কথায় বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল—"বা রে, তা কি করে হবে? তোমরা তো তা'হলে ফাঁকেই পড়লে।"

দেবেন্দ্রর পত্নী বলিল—"তা নয় ভাই! এর পর বুঝবি, তোর চেয়েও লাভের ভাগ বেশী আমাদের। এ হাটের বেচা-কেনায় বিকিয়ে গিয়ে চায়না মূল্।" বলিয়া আদর করিয়া তাহার গাল টিপিয়া দিল।

এই সরলা কিশোরীকে বুকে ধরিয়া সোনার বুক যেন জুড়াইয়া গেল! দেবেন্দ্রর পত্নীর দিকে চাহিয়া সে কহিল—"সত্যি ভাই, আমাদের বড় পুণ্যের জোর—অনেক তপস্যার ফলে স্বর্গের ঝরা ফুলটিকে কুড়িয়ে পেয়েছি!"

দেবেন্দ্রর পত্নী কহিল—"মেয়ে মানুষ হয়ে আমি নারী হৃদয়ের যে রহস্যের সন্ধান এতকাল পাইনি, আজ তোমাকে পেয়ে—তোমার কথায়—সেই আসল খাঁটি জিনিষ দেখছি চোখের উপর জ্বল্-জ্বল্ করছে! আমার বড় গর্ব্ব যে, মেয়ে হয়ে জন্মেছি! একটু পায়ের ধুলো দাও দিদি, আশীর্ব্বাদ করো যেন তোমার মত—" বলিতে বলিতে সে মাথা নামাইলে সোনা দু'হাতে তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া গদ্‌গদ কণ্ঠে বলিল—"পতির প্রাণে প্রাণ মিশিয়ে জন্ম-এয়োস্ত্রী হয়ে থাকো।"

* * * এমনি করিয়া এই তিনটি নারীর হৃদয়ের

আদান-প্রদান···অনুমানে তাহা বুঝিয়া দেবেন্দ্র কম আশ্চর্য্য হইল না। পত্নীকে কৌতূহলভরে সে প্রশ্ন করিল—"কেমন বুঝলে ?"

"বুঝলুম—একদিকে যেমন স্বর্গের ফুল কুড়িয়ে পেয়েছি, ওদিকে তেমন ভাগ্যবশে মা সতীরাণীর আশীর্ব্বাদ! তোমার মনে বড় অহঙ্কার ছিল যে বন্ধুর জন্য সর্ব্বস্ব—এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে পারো। কিন্তু জানো তো, দর্পহারী মধুসূদন কারো দর্প রাখেন না। তোমার দর্প চূর্ণ হয়েছে। নিঃস্বার্থ প্রেমে আত্মদান কথার কথা নয়, কত মহৎ—কত পবিত্র—তা এতদিনে চাক্ষুষ দেখছি! এ প্রেমের এক বিন্দুর অধিকারী হতে পারলে বনে গিয়ে তপস্যা করতে হয় না, প্রেমময়কে ঘরে বসে পাওয়া যায় চিরকালের মত!"

ইহার মধ্যে সোনা নিঃশব্দ গম্ভীর পাদক্ষেপে আসিয়া অসঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করিল—"সুধী-দা কবে আসবেন, কিছু খবর পেয়েছো দাদা ?"

তাহার মুখের দিকে দেবেন্দ্র চাহিতে পারিল না, মাথা নত করিয়া জবাব দিল—" এই মাত্র খবর পেলুম, আজ সন্ধ্যার পর এসে পৌঁছুবে। তোমরা তৈরী থাকো।"

সন্ধ্যার পর সুধীন্দ্র যখন কৃষ্ণনগর হইতে ফিরিয়া দেবেন্দ্রর বাড়ীতে আসিয়া পৌঁছিল, তখন সে স্বপ্নেও ভাবে নাই, কত বড় বিস্ময় এখানে সঞ্চিত আছে! অত বড় অসুখ সারিয়া উঠিবার পর নিজের অজ্ঞাতে কেমন করিয়া তাহার সারা মন কিভাবে

এই চঞ্চল মেয়েটির দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেছিল, উদ্দেশ না পাইলেও কৃষ্ণনগরে গিয়া যখন বড় ফাঁকা—একা-একা বোধ হইতে লাগিল, তখন আর নূতন জায়গা দেখার লোভে একটা দিন বিলম্ব করিতে পারিল না—কাজ সারিয়া তখনই কলিকাতায় রওনা হইয়াছে।

এদিকে টেলিগ্রাম পাইয়া দেবেন্দ্র উন্মুখ হইয়া বন্ধুর প্রতীক্ষা করিতেছিল—গাড়ী আসিয়া সদরে দাঁড়াইতেই সে ছুটিয়া বন্ধুকে আনিতে গেল।

সুধীন্দ্র প্রশ্ন করিল, "খবর সব ভালো তো দেবী ?"

সঙ্গে সঙ্গে তাহার মুখ কর্ণমূল পর্য্যন্ত রাঙা হইয়া উঠিল, দেবেন্দ্রর লক্ষ্য এড়াইল না। সকলের কুশল সংবাদ দিয়া দেবেন্দ্র তাহাকে লইয়া উপরে আসিল।

উপরের বৈঠকখানায় জীবনবাবু একা বসিয়া সট্‌কায় ধূমপান করিতেছেন। সুধীন্দ্রর শারীরিক অবস্থা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া কাজের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। সুধীন্দ্র সব খবর দিল। দেবেন্দ্র ওদিকে বাড়ীর ভিতর চলিয়া গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিয়া হাসিমুখে কহিল—"একবার বাড়ীর ভিতরে আয় রে সুধী। মুখ-হাত ধুবি।"

ভিতর বাড়ীতে যাইতে দু'চার কথায় সুধীন্দ্র যখন শুনিল, বাড়ীতে জীবনবাবু ভিন্ন অন্য গুরুজন কেহ নাই, তখন সঙ্কোচের ভাব অনেকখানি কমিল। একটা ঘরের মেঝেয় বড় কার্পেট পাতিয়া পরিষ্কার বিছানা। সেই ঘরে আনিয়া দেবেন্দ্র বন্ধুকে কহিল, "বোস্, জল নিয়ে আসছে।"

সুধীন্দ্র বসিল না, এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া যেন কোনো-কিছুর প্রত্যাশায় আকুল!

দেবেন্দ্রর পত্নী রমা আসিয়া কহিল—"তোমাকে কক্ষনো দেখিনি ঠাকুরপো!···তবু লজ্জা করতে পারলুম না ভাই। মাপ করো, আপনি না বলে তুমি বলছি গোড়া থেকেই! জানি, তুমি কি খুঁজছো! যা খুঁজছো, পাবে···ভয় নেই। আগে মুখ-হাত ধুয়ে ভালো হয়ে বসো।"

সুধীন্দ্র মুখ-হাত ধুইয়া ঘরে গিয়া বসিল, এবং অপ্রতিভ ভাবটুকু কাটাইয়া লইতে আকুল নয়নে যেন কাহার অন্বেষণ করিতেছে! দেবেন্দ্র সরিয়া পড়িয়াছিল। রমা জলখাবার সাজাইয়া আনিয়া কহিল—"খাও···ঘরের তৈরী।"

ঈষৎ হাসিয়া সুধীন্দ্র কহিল—"এত খাবার বৌদি! আমি কি রাক্ষস?"

"চোখ দুটো তো দেখছি তেমনি! কাকে গিল্‌বে গিল্‌বে বলে চারিদিকে ঘুরছে।"

সুধীন্দ্র লজ্জিতভাবে আবার হাত গুটাইয়া বসিল। রমা কহিল—"আচ্ছা দাঁড়াও—তোমার ভয় ভাঙাবার মাদুলি নিয়ে আসি।" বলিয়া চকিতে বাহির হইয়া গেল।

এ কথার ইঙ্গিতে সুধীন্দ্র কি জবাব দিবে, ভাবিতেছে—ভাবা আর হইল না। তখনি অপর্ণাকে ধরিয়া বন্ধু-পত্নীর সহিত চির-পরিচিত আর একটি মুখ সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল—শিহরিয়া সুধীন্দ্র তখনি পাথরের মূর্ত্তির মত একেবারে স্তম্ভিত!

সোনা বেশ পরিষ্কার কণ্ঠে বলিল—"ছোট হলেও গরীবের

দান নিতে হবে সুধী-দা। একদিন আমার উপরোধ পায়ে ঠেলে চলে গিয়েছিলে! তার জন্য আমার খুব রাগ—সে রাগ এখনো যায়নি ভাই!" বলিয়া অপর্ণার হাত ধরিয়া টানিয়া আনিয়া তার হাত সুধীন্দ্রর হাতের উপর রাখিল।

যেন বিদ্যুতের স্পর্শ! সুধীন্দ্র কাঁপিয়া উঠিল! তার দুচোখ জলে ভরিয়া আসিল। গদ্‌গদ কণ্ঠে সুধীন্দ্র কহিল, "আমার সে অপরাধ মাপ করো সোনা।"

রমা বলিল—"এই যে বোল ফুটেছে! পরশমণির ছোঁয়া!"

"চুপ করো।" বলিয়া সোনা মুখ ঘুরাইয়া হাসি চাপিতে চাপিতে কহিল—"মাপ করবো—কিন্তু এখন নয়! তা'হলে তুমি আবার ভুলে যাবে। তার আগে তুমি আমাকে মন খুলে মাপ করো।"

সুধীন্দ্র মুখ নামাইল।

সোনা গিয়া জীবনবাবুকে ধরিয়া আনিল।

জীবনবাবু আসিলেন—তাঁর সঙ্গে রমা, দেবেন্দ্র। তাঁদের পিছনে ধান-দূর্ব্বার রেকাব হাতে লইয়া সোনা আসিল। দেখিয়া সুধীন্দ্র জড়সড় হইয়া বসিল। দেবেন্দ্র কহিল—"কাকা তোকে আশীর্ব্বাদ করতে এসেছেন সুধী।"

সুধীন্দ্রর আঙুলে একটা হীরার আংটি স্বহস্তে পরাইয়া দিয়া তারপর ধান-দূর্ব্বা মাথায় দিয়া জীবনবাবু আশীর্ব্বাদ করিলেন। সুধীন্দ্র প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা লইল। রমা ঘরের বাহির হইতে শাঁখ বাজাইল।

দেবেন্দ্র ডাকিল—"গিরিশ-দা···আসুন।"

সুধীন্দ্র আর একবার কাঁপিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিল! গিরিশ-চন্দ্র ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন—"আমার উপর রাগ রেখো না সুধী। আমার কোনো দোষ নেই, সব তোমার এই সোনার কাজ।"

সুধীন্দ্র কহিল—"আমায় মাপ করো, দাদা!"

গিরিশচন্দ্র তাহার মাথায় ধান-দূর্ব্বা দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া জীবনবাবুকে কহিলেন—"আমায় ভাইয়ের বিয়ে—আমি বর-কর্ত্তা···অনুমতি করুন—আপনার কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করে যাই।···কাছে এসো তো মা।"

অর্পণা উঠিয়া আসিয়া গিরিশচন্দ্রের সম্মুখে মাথা নীচু করিয়া বসিল। সোনার সেই গহনার বাক্সটা গিরিশচন্দ্র অপর্ণার হাতে দিলেন, তারপর মাথায় ধান-দূর্ব্বা দিয়া বলিলেন—"রাজ-রাণী হয়ো! বংশের মুখ উজ্জ্বল করো মা। হাতের নোয়া, মাথার সিঁদুর অক্ষয় হোক! সুপুত্রবতী হও!"

আবার শাঁখ বাজিল। অপর্ণার মাথা আপনা হইতে আনত হইল।

* * * * *

দেবেন্দ্রর কাছে পনেরো হাজার টাকা ধার লইয়া ত্রিশ হাজার লিখিয়া দিতে হইয়াছিল বলিয়া দেনার দায়ে অধিকাংশ সম্পত্তি তাহার নামে খোশ্-কবালা করিয়া দেওয়ার পর রবীন্দ্র অনেকখানি নিশ্চিন্ত হইয়াছিল। লাটের কিস্তির টাকা মিটাইয়া দেওয়ার ভার দেবেন্দ্রনাথ নিজের হাতে লইয়াছে—ইহাতে রবীন্দ্রর দুশ্চিন্তার কারণ ছিল না।

হারাধন এবং মহেশ ঘোষ এখনও নিরীহ রবীন্দ্রর নরম

ঘাড়ের রক্ত-পানের স্পৃহা ত্যাগ করিতে পারে নাই।

সেদিন আড্ডা-ঘরে হল্লা চলিয়াছে—পালের গোদা হারাধন আর মহেশ ঘোষ পূরাদমে রবীন্দ্রর কচি মাথা চর্ব্বণের পর রোমন্থন করিতেছে—রবীন্দ্র মাথা খোয়াইয়া সর্ব্বস্ব খোয়াইয়াও ভাঙ্গা হাটের সৌষ্ঠবটুকু টানিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছে—এমন সময় আড্ডাঘরের বাহির হইতে গম্ভীরকণ্ঠে আহ্বান—"রবি !"

সকলে মুহূর্ত্তে স্তব্ধ হইয়া মুখ চাওয়া-চায়ি করিতে লাগিল। রবীন্দ্র ভয়ে ভয়ে কহিল—"দাদার গলা না ?"

হারাধন বলিয়া উঠিল—"আরে দূর, সে এ্যাদ্দিনে কোথায় হ্যাঁ, ভূত···ভূত !"

কিন্তু ভূতের ব্যাপার জমিবার পূর্ব্বেই চার পাঁচ জন লোক লইয়া গিরিশচন্দ্র ঘরে ঢুকিলেন। ঢুকিয়াই বলিলেন, "এ দুটোর কান ধরে টেনে নিয়ে যাও।"

মুহূর্ত্তে তেওয়ারীর সহিত আর দু'জন দরোয়ান আসিয়া মহেশ ঘোষ এবং হারাধনকে শক্ত করিয়া ধরিল। হারাধন চীৎকার করিয়া উঠিল।

রবীন্দ্রর মাথা মাটিতে ঠেকিল। সুধীন্দ্র আসিয়া কহিল—"এখনি এ নরক থেকে উঠে আয়, রবি।"

কিন্তু শত চেষ্টাতে রবীন্দ্র উঠিতে পারিল না। তাহাকে কে যেন তাকিয়ার সঙ্গে কষিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছে! সুধীন্দ্র স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বলিল—"ভয় নেই রবি! কাছে আয়।"

রবি আর থাকিতে পারিল না, উঠিয়া আসিয়া সুধীন্দ্রর

পায়ে লুটাইয়া পড়িল—স্খলিত কণ্ঠে কহিল—"আমার সব দোষ মাপ করো দাদা। আমায় কোনো কথা জিজ্ঞাসা করো না··· তোমার পায়ে ধরে বলছি, জীবনে আর কখনো—"

সুধীন্দ্র তাহাকে তুলিয়া বুকে টানিয়া ধরিলেন···"ঠিক আছে, তুই আমার ছোট ভাই, আমি দাদা···আমরা যা, তাই আছি। কিন্তু যাক, আগে গিরিশ-দার পা দু'খানা মাথায় নিয়ে তাঁর কাছে মাপ চা! ওঁর অপমান করেছিস তুই—সে মহাপাপ ঘুচুক।"

রবীন্দ্র তখনি গিরিশচন্দ্রের পায়ে লুটাইয়া পড়িল, বলিল—"তোমার কাছে আমার অপরাধের সীমা নেই গিরিশ-দা!"

তাহাকে আলিঙ্গন-বদ্ধ করিয়া গিরিশচন্দ্র কহিলেন—"ওরে রবি, ওরে রবি···এতটুকু বেলা থেকে এই বুকের উপর তোরা—"

রবীন্দ্র কহিল "ঐ হারাধন আর মহেশ ঘোষ—"

"জানি ভাই, তাদের ব্যবস্থা করবো! এখন ঘরে আয়।"

* * *

ভোর হইতে না হইতে সারা দেশের লোক জমিদার-বাড়ীর প্রাঙ্গণে আসিয়া ভিড় করিয়া দাঁড়াইল। গিরিশচন্দ্র, সুধীন্দ্র, রবীন্দ্র, দেবেন্দ্র এবং জীবনবাবু একসঙ্গে ভিতর বাড়ী হইতে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইতেই আনন্দরোল উঠিল। গিরিশচন্দ্র বলিলেন—"তোমাদের রাজাকে এনে দিয়ে আমি ছুটী নিচ্ছি···যার যা বলবার আছে এঁর কাছে বলো।"

"কিছু বলবার নেই, শুধু বড়বাবুর পায়ে নিবেদন—দয়া করে যদি ফিরেছো দেবতা, আর আমাদের পায়ে ঠেলো না।"

"না। তোমরা নিশ্চিন্ত থাকো—উনি কখনো যাবেন না।" বলিতে বলিতে অপর্ণার হাত ধরিয়া সোনা আসিয়া উপস্থিত হইল। সোনা বলিল, "তোমরা আমাকে এতটুকু বেলা থেকে মেয়ের মত ভালোবাসো···তোমাদের কাছে আমার লজ্জা নেই —তাই আমার এ বোনটিকে—তোমাদের রাণী করে দিয়ে আমি খালাশ হতে চাই আজ।" বলিয়া সকলের সামনে সুধীন্দ্রর হাতে অপর্ণার হাতখানা রাখিল···একতাড়া কাগজ সুধীন্দ্রর হাতে দিয়া দেবেন্দ্র বলিল—"আর এই আমার বোনের যৌতুক।"

কাগজগুলা খুলিয়া দেখিয়া বিস্ময়ভরে সুধীন্দ্র বলিল, "এ কি! সম্পত্তির তিন ভাগ যে তুমি কিনে নেছ। এ তোমার— আমি নেবো কেন? আমাদের যে সিকিভাগ আছে, তাতেই আমাদের দু'ভায়ের বেশ চলে যাবে।"

দেবেন্দ্রর চক্ষু সজল হইয়া উঠিল। সে বলিল "যে পনেরো হাজার টাকা আমি দিয়েছিলুম, তার এক পয়সাও আমার নয় —সব আমার এই সোনার টাকা। ওদের জীবনের সম্বল যা-কিছু···সর্ব্বস্ব!"

"এঁ্যা···এঁ্যা···সোনা! গিরিশদা!" সুধীন্দ্র ও রবীন্দ্র মহা বিস্ময়ভরে চীৎকার করিয়া উঠিল।

হাসিয়া গিরিশচন্দ্র বলিলেন, "আমি নই ভাই···আমি নই, সব নাটের গুরু এই সোনা!"

শেষ